ডা. এম. নজরুল ইসলাম

# চোখের সাধারণ সমস্যা

## ১০০ প্রশ্ন ও উত্তর

# চোখের সাধারণ সমস্যা
# ১০০
# প্রশ্ন ও উত্তর

# চোখের সাধারণ সমস্যা
# ১০০
# প্রশ্ন ও উত্তর

ডা. এম. নজরুল ইসলাম
এমবিবিএস, এমসিপিএস (চক্ষু) ডিও এফসিপিএস (চক্ষু)
ফেলো ইন ফ্যাকো সার্জারী (ব্যাংকক)
আন্তর্জাতিক ফেলো ইন গ্লকোমা (আমেরিকা)
সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগ
বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৮

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১২০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সিঙ্গাপুর পরিবেশক | শহীদ ট্রাভেল্‌স এন্ড ট্যুরস প্রাঃ লিঃ
১৮১ কিচেনার রোড, ০১-১২/১৩ নিউ পার্ক হোটেল
শপিং আর্কেড, সিঙ্গাপুর ২০৮৫৩৩

Chokher Shadharon Shamoshya
100 proshno O Uttar | Dr. M. Nazrul Islam

Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 120.00 only
ISBN : 984 868 487 5

আমার অনেক আদরের
মা-মনি সাবা ইসলাম
বাবা আমিদ ইসলাম নিলয় ও
আব্বু সাদ ইসলাম ইকরামকে

## ভূমিকা

চোখের সাধারণ সমস্যা ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাদের সকলের। চোখের অনেক সমস্যার সময়মত প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা না গেলে দৃষ্টিশক্তির মারাত্মক ক্ষতিসাধন হতে পারে, এমনকি অন্ধত্বও হতে পারে।

পত্রপত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হলে কিংবা টিভিতে সাক্ষাৎকার গেলে অনেক পাঠক ও রোগী চোখ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে থাকেন। তখন থেকেই এ ধরনের একটি বই লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম।

কম্পিউটার ব্যবহার করলে কি চোখের সমস্যা হয় ? কাছে বসে টিভি দেখলে কি চোখের অসুবিধা হয় ? শিশুদের চোখ কখন পরীক্ষা করানো উচিত ? ফ্যাকো সার্জারী কি ? অলস চোখ কাকে বলে ? ডায়াবেটিসে চোখ অন্ধ হয় কেন ? ল্যাসিক সার্জারী কাকে বলে ? চোখে মাঝে মধ্যে 'ব্লাক আউট হবার কারণ কি ? চোখে চুন পড়লে তার চিকিৎসা কি ? চোখের কোটর থেকে চোখ বেরিয়ে আসে কেন ? উচ্চ রক্তচাপ থেকে চোখে কি কোন জটিলতা হতে পারে ? চল্লিশ বছর বয়সে চশমা লাগে কেন ? মদ্যপানে কি চোখ অন্ধ হয় ? কি কি ওষুধ চোখের জন্য ক্ষতিকর ? চোখের কৃত্রিম লেন্স কোনটি ভালো এরকম শত শত প্রশ্ন। তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও রোগীদের কথা বিবেচনা করে চোখের সাধারণ সমস্যার উপর ১০০ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। বারডেম হাসপাতাল চক্ষু বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ,কে, আজাদ খান, অনুসন্ধিৎসু পাঠক, দর্শক, রোগী যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা আমার এ বই লেখার কাজকে সহজ করে তুলেছে– তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার স্ত্রী ডাঃ নাজমা ইয়াসমীনের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণাতে এ বই লেখা সম্ভব হয়েছে। এই বই লিখতে গিয়ে আমার তিন ছেলেমেয়ে নিলয়, সাবা এবং ইকরাম আমার সাহচার্য থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে তা সার্থক হবে যদি এ বই কারো কাজে লাগে।

বইটি প্রকাশের জন্য অন্যপ্রকাশ এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিশেষভাবে জনাব মাজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ্ নাসেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রয়াসে মেডিকেল ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলার ব্যবহার করা হয়েছে। বইটিতে বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক অনুসৃত বানান বিধিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। চক্ষু রোগীদের চোখের সমস্যার কথা বিবেচনা করে বইটিতে তুলনামূলক বড় অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। এ বইয়ের গঠনমূলক সমালোচনা এবং যে কোন মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ডা. এম. নজরুল ইসলাম
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সূচিপত্র


- কম্পিউটার ব্যবহার করলে কি চোখের সমস্যা হয় ? ১৩
- কাছে বসে টিভি দেখলে কি চোখের অসুবিধা হয় ? ১৪
- চোখ ট্যারা হয় কেন ? ১৫
- চশমার দোকান থেকে 'রেডিমেড' চশমা কিনে পরা কি ঠিক ? ১৬
- শিশুদের চোখ কখন পরীক্ষা করানো উচিত ? ১৭
- এক চোখে না দেখলে বা কম দেখলে কি গাড়ী চালানো যায় ? ১৭
- চশমা বানাবার পর তা কি আবার চক্ষু বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত ? ১৮
- চশমা একবার পরলে তা কি আবার ছাড়া যায় ? ১৮
- কন্টাক্ট লেন্স কি চোখের জন্যে ক্ষতিকর ? ১৯
- কন্টাক্ট লেন্স একবারে কতদিন চোখে রাখা যায় ? ২০
- রঙিন কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারে চোখে কোন অসুবিধা হয় কি ? ২০
- অল্প আলোতে পড়লে কি চোখের ক্ষতি হয় ? ২১
- আমার চোখে চশমা লাগলে কি আমার বাচ্চাদেরও লাগবে ? ২১
- অলস চোখ কাকে বলে ? ২২
- চোখের গ্লকোমা কাকে বলে ? ২২
- চোখের ছানি বলতে কি বোঝায় ? ২৩
- ফ্যাকো সার্জারী কি ? ২৪
- ছানি অপারেশন এর পর কোন্ কৃত্রিম লেন্স সবচেয়ে ভালো ? ২৫
- চোখ শুষ্ক হয় কেন ? ২৬
- ডায়াবেটিসে চোখের কি কি জটিলতা হয় ? ২৭
- ডায়াবেটিসে লেজার করলে কি চোখ ভালো হয়ে যায় ? ২৮
- চোখের লেজার বলতে কি বুঝায় ? ২৯
- 'চোখের প্রেসার' বলতে কি বুঝায় ? ২৯
- হঠাৎ চেখে ময়লা পড়লে কি করবো ? ৩০
- আমার 'গ্লকোমা' রোগ আছে কিনা বুঝবো কিভাবে ? ৩১
- চোখে 'ম্যাকুলার ডিজেনারেশান' আছে কিনা বুঝবো কিভাবে ? ৩১
- আমরা কিভাবে দেখি ? ৩২

- চোখের পাতায় কি উকুন হতে পারে ? ৩৩
- চোখ তুলে ফেলার পর কি কারও দান করা ভালো চোখ লাগানো যায় ? ৩৪
- চোখ লাল হয় কেন ? ৩৪
- 'কিডনি দান' এর মত আমিও কি জীবিত অবস্থায় চক্ষু দান করতে পারি ? ৩৫
- দান করা চোখ লাগানোর পর কি চোখে ভালো দেখা যায় ? ৩৫
- অনেকে রাত্রে দেখতে পারেন না কেন ? ৩৬
- অনেকের মাঠে কাজ করতে গিয়ে চোখে ইনফেকশন হয়- এর কারণ কি ? ৩৬
- নবজাতকের চোখ ওঠা- মারাত্মক কেন ? ৩৭
- ডায়াবেটিসে চোখ অন্ধ হয় কেন ? ৩৮
- কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা বলতে কি বোঝায় ? ৩৮
- সানগ্লাস বা রোদ চশমার উপকারিতা কি ? ৪০
- রং পরিবর্তনশীল ফটোক্রমিক গ্লাস বা চশমা কাকে বলে ? ৪১
- আয়না চশমা কাকে বলে ? ৪১
- চশমা পড়লে চামড়ার এলার্জি হয় কেন ? ৪২
- কিভাবে চশমা ও গ্লাসের যত্ন নিতে হবে ? ৪২
- ডায়াবেটিসে চোখের ভেতর লেজার চিকিৎসার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি ? ৪৩
- ডায়াবেটিসে চোখের পাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন হয় কেন ? ৪৪
- পানি, চা বা কফি খেলে কি চোখের গ্লকোমা হয় ? ৪৫
- দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে- চোখে ছানি নাকি গ্লকোমা হয়েছে ? ৪৬
- উচ্চ রক্তচাপের সাথে কি চোখের উচ্চ চাপ বা গ্লকোমার কোন সম্পর্ক আছে ? ৪৬
- চোখের প্রেসার বাড়লেই কি গ্লকোমা হয় ? ৪৭
- চোখের প্রেসার স্বাভাবিক থেকেও কি গ্লকোমা হতে পারে ? ৪৭
- অনেকক্ষণ পড়াশোনা, সেলাই করা বা টিভি দেখলে কি গ্লকোমা হয় ? ৪৮
- গ্লকোমা প্রতিরোধ করার উপায় কি ? ৪৯
- চক্ষুদান বলতে কি বোঝায় ? ৫০
- দিন কানা কাকে বলে ? ৫০
- সাধারণ চোখ ওঠা রোগে কি চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত ? ৫০
- ৬/৬ চোখের দৃষ্টি বলতে কি বোঝায় ? ৫১

- ল্যাসিক সার্জারী কাকে বলে ? ৫২
- কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রোম কাকে বলে ? ৫৪
- ট্রাকোমা অন্ধত্ব কিভাবে হয় ? ৫৭
- শিশুদের ভিটামিন এ'র অভাবে চোখে কি কি অসুবিধা হয় ? ৫৭
- চোখের প্রদাহ আইরাইটিস হলে কিভাবে বুঝবো ? ৫৮
- চোখে কি কোন ক্যানসার হয় ? ৫৮
- চোখের কি কি জন্মগত ত্রুটি হতে পারে ? ৫৯
- জন্মগত চোখের ছানির চিকিৎসা কি ? ৫৯
- জন্মগত চোখের গ্লকোমা রোগের কোন চিকিৎসা আছে কি ? ৬০
- অনেকে চোখের সামনে কালো স্পট দেখেন- এর কারণ কি ? ৬০
- হঠাৎ করে চোখে না দেখার কারণ কি ? ৬১
- চোখে মাঝে মধ্যে 'ব্লাক আউট' হবার কারণ কি ? ৬১
- চোখের মধ্যে কি কৃমি হতে পারে ? ৬১
- চোখ দেখে কি মস্তিষ্কের টিউমার বোঝা যায় ? ৬২
- অনেকে চোখে 'ডবল ভিশন' বা দুইটি করে জিনিস দেখেন এর কারণ কি ? ৬২
- অনেকের চোখ অনবরত নড়ে- এর কারণ কি ? ৬৩
- চোখের 'অঞ্জনি' কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ভালো হয় ? ৬৩
- চোখের এলার্জি হলে কি ঠান্ডা পানি ভালো কাজ করে ? ৬৪
- কারও চোখে এসিড নিক্ষেপ করা হলে তার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা কি ? ৬৪
- চোখে চুন পড়লে তার চিকিৎসা কি ? ৬৪
- অনেকের চোখের উপরের পাতা ঝুলে যায় বা চোখ ছোট হয়ে যায় এর কারণ কি ? ৬৫
- নবজাতক শিশুদের চোখ দিয়ে পানি পড়ে কেন ? ৬৬
- চোখের কোটর থেকে চোখ বেরিয়ে আসে কেন ? ৬৬
- 'কালার ব্লাইন্ড' বা বর্ণান্ধ কেন হয় ? ৬৭
- বৈদ্যুতিক শকে চোখের কি কোন ক্ষতি হয় ? ৬৭
- চোখের নার্ভ প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত হলে কি হয় ? ৬৮
- কৃত্রিম চক্ষু সংযোজন কি সম্ভব ? ৬৮
- উচ্চ রক্তচাপ থেকে চোখে কি কোন জটিলতা হতে পারে ? ৬৯

- গর্ভবতী মায়েদের চোখে কি কি সমস্যা হতে পারে ? ৬৯
- রক্তশূন্যতা হলে চোখের কি জটিলতা হতে পারে ? ৭০
- চোখের ভেতর পানি জমে কেন ? ৭০
- 'এইডস' রোগে চোখের কি কি জটিলতা হতে পারে ? ৭১
- চোখের 'মরনিং গ্লোরি' সিনড্রম কাকে বলে ? ৭১
- চোখের কোন কোন সমস্যায় সত্বর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত ? ৭২
- কর্ণিয়ার আলসার বা চোখে ক্ষত হলে কি করণীয় ? ৭২
- চোখের কসমেটিক্স ব্যবহারে কি কি সতর্কতা প্রয়োজন ? ৭২
- একজন গ্লকোমা রোগীর কি কি করণীয় ? ৭৩
- 'ভিসুয়াল ফিল্ড এনালাইসিস' পরীক্ষাটি কি এবং কেন করা হয় ? ৭৩
- চক্ষু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বর্তমানে কি কি আধুনিক পরীক্ষা করা হয় ? ৭৪
- গ্লকোমা রোগ কি লেজার চিকিৎসায় ভালো হয় ? ৭৬
- চোখের ছানির আধুনিক চিকিৎসা 'ফ্যাকো সার্জারী' কি নিরাপদ ? ৭৬
- চোখের সমস্যার জন্য কি মাথা ব্যথা হয় ? ৭৭
- চল্লিশ বছর বয়সে চশমা লাগে কেন ? ৭৭
- মদ্যপানে কি চোখ অন্ধ হয় ? ৭৭
- কি কি ওষুধ চোখের জন্য ক্ষতিকর ? ৭৮

**প্রশ্ন : কম্পিউটার ব্যবহার করলে কি চোখের সমস্যা হয়?**

উত্তর : কম্পিউটার ব্যবহার করলে চোখের সরাসরি কোন ক্ষতি হয় না। তবে দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করলে চোখের পলক কম পড়ে এবং চোখ কিছুটা শুষ্ক হয়ে যায়। ঘাড়, মাথা বা চোখে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। দুর্বল ও ক্লান্তি লাগতে পারে। এ সকল উপসর্গকে 'কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রম' বলা হয়ে থাকে।

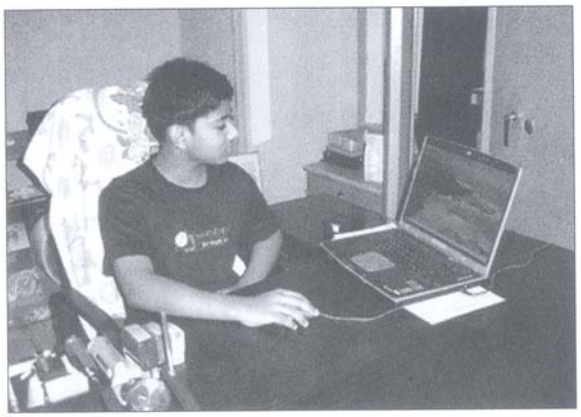

কম্পিউটারে কাজ করার সময় ঘন ঘন চোখের পলক ফেলা, ২/১ ঘন্টা কম্পিউটারে কাজ করার পর চোখের ৫/৭ মিনিট বিশ্রাম নেয়া বা অন্য কোন দিকে তাকানো, মনিটরের সামনে সোজাসুজি বসে কাজ করা ইত্যাদি কম্পিউটার ব্যবহারে আরামদায়ক হতে পারে।

কম্পিউটারের এল.সি.ডি মনিটর সাধারণ মনিটরের তুলনায় চোখের জন্য আরামদায়ক। এজন্য দীর্ঘক্ষণ কাজ করার জন্যে পিসিতে এলসি.ডি মনিটর কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটার ব্যবহার করা যেতে পারে।

এরপরও কারও চোখের কষ্ট থাকলে চক্ষু বিশেষজ্ঞ এর নিকট চোখের পাওয়ার, চোখের প্রেসার পরীক্ষা করানো উচিত, কারণ চোখের কোন সমস্যার কারণেও কম্পিউটার ব্যবহার আরামদায়ক নাও হতে পারে।

**প্রশ্ন : কাছে বসে টিভি দেখলে কি চোখের অসুবিধা হয় ?**

উত্তর : কাছে বসে টিভি দেখলে চোখের অসুবিধা হয়- এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আমেরিকান একাডেমি অব অফথ্যালমোলজীর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে- অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরাই বেশি কাছে বসে টিভি দেখে থাকে।
শিশুদের 'কাছে ফোকাস' করার ক্ষমতা বা একোমোডেশন শক্তি বড়দের তুলনায়

অনেক বেশি। এজন্যে তারা কাছে বসে টিভি দেখার অভ্যাস করে ফেলে।
অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে টিভি থেকে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় বিধায় অনেকক্ষণ কাছে বসে টিভি দেখলে চোখের ক্লান্তি হতে পারে।
যে সমস্ত শিশু বা বয়স্কগণ কাছে ভালো দেখেন কিন্তু দূরে দেখতে পান না তারাও খুব কাছে বসে টিভি দেখে থাকেন। সুতরাং শিশু কিংবা বয়স্ক যারাই কাছে বসে টিভি দেখেন তাদের চোখ পরীক্ষা করা উচিত এবং প্রয়োজনে চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা উচিত।

**প্রশ্ন : চোখ ট্যারা হয় কেন?**

উত্তর : নানা কারণে চোখ ট্যারা হতে পারে। প্রথমত বংশগত কারণে। বাবা-মা পূর্ব পুরুষের ট্যারা চোখের ইতিহাস থাকলে শিশুরাও চোখ ট্যারা নিয়ে জন্মাতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চোখের মাংশপেশির অসামঞ্জস্যতাই দায়ী।

এছাড়া চোখের পাওয়ার খুবই বেশি প্লাস কিংবা মাইনাস থাকলে, কোন কারণে এক চোখের দৃষ্টি বেশি কম থাকলে জন্মের পরও চোখ ট্যারা হয়ে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে চশমা নেয়া বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করতে হবে, তাহলে ট্যারা চোখ ভালো হবার সম্ভাবনা থাকবে।

বংশগত ট্যারা চোখে সাধারণত: ছোটবেলায় দুই চোখেই ভালো দেখার পাওয়ার থাকে। কিন্তু এক চোখ ট্যারা থাকার দরুন সেই চোখে দৃষ্টির সম্পুর্ণ উন্নতি সাধন হয় না। পরবর্তীতে ঐ চোখ অলস চোখ (lazy eye) এ পরিণত হয়। সেইজন্য শিশুদের বেলায় যদি চোখের পাওয়ার ঠিক থাকে তাহলে অপারেশন এর মাধ্যমে চোখ সোজা করে নেয়া উচিত। যত অল্প বয়সে করবে তত দুই চোখের দৃষ্টির উন্নতি হবে। তবে সাধারণত: ৮ বছর বয়স হবার পূর্বেই চিকিৎসা বা অপারেশন করাতে হবে। এরপরে চিকিৎসা করলে আশানুরূপ দৃষ্টির উন্নতি সম্ভব নাও হতে পারে।

**প্রশ্ন : চশমার দোকান থেকে 'রেডিমেড' চশমা কিনে পরা কি ঠিক?**

উত্তর : সাধারণত: বয়স ৩৫-৪০ বছর হলে অনেকেই নিকটে কম দেখতে শুরু করেন। তখন সহজেই এবং সস্তায় চশমার দোকান থেকে +১.০০ বা এর অধিক পাওয়ার এর চশমা কিনে ব্যবহার করতে শুরু করেন। ঐ চশমা দিয়ে বেশিরভাগ লোকই ভালো দেখতে পারেন এবং এতে চোখের কোন ক্ষতি হয় না। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য শতকরা ১০০ ভাগ ঠিক পাওয়ার না মিললে- চোখে ১০০ ভাগ সঠিক

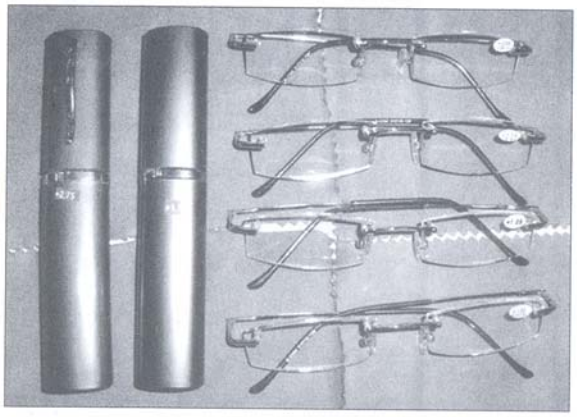

দেখা যায় না এবং চোখের ব্যাথা সহ নানা উপসর্গ হতে পারে। যে সকল ব্যক্তির দূরের ও পাওয়ার থাকে বা বাকা পাওয়ার (astigmatism) থাকে তাদের জন্য ঐ 'রেডিমেড' চশমা খুব ভালো কাজ করে না এবং আরামদায়কও হয় না। তাদের ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে প্রয়োজনীয় চশমা তৈরী করে নেয়া ভালো।

**প্রশ্ন : শিশুদের চোখ কখন পরীক্ষা করানো উচিত?**

উত্তর : যে সকল শিশুর চোখের কোন সমস্যা নেই, দেখার ও কোন সমস্যা নেই তাদের স্কুলে যাবার পূর্বে একবার পরীক্ষা করানো উচিত। কারণ চোখের অনেক রোগই আছে যা বাবা মার নজরে নাও আসতে পারে। অনেক বড় হয়ে ঐ রোগ ধরা পড়লে- সঠিক চিকিৎসার সময় পার হয়ে যেতে পারে।

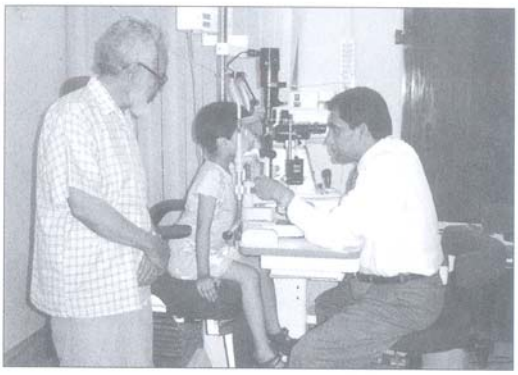

এছাড়া যেসব শিশুর দেখতে সমস্যা হয়, নিকটে গিয়ে টিভি দেখে, চোখের পরিমাপ খুব ছোট বা বড় হলে, চোখের জন্মগত কোন ত্রুটি মনে হলে, চোখের মণিতে সাদা কোন দাগ মনে হলে, চোখ দিয়ে পানি পড়লে ইত্যাদি নানা সমস্যায়- যে কোন বয়সেই শিশুর চোখ পরীক্ষা করানো উচিত।

**প্রশ্ন : এক চোখে না দেখলে বা কম দেখলে কি গাড়ী চালানো যায়?**

উত্তর : এক চোখে দেখে গাড়ী চালানো গেলেও তা করা উচিত নয়। গাড়ী চালাবার সময় সোজাসুজি এবং পাশাপাশি দেখা, ঠিক রং দেখা, দৃষ্টির গভীরতা (depth of perception) থাকা, রাতে ঠিক দেখা ইত্যাদির প্রয়োজন। একটি চোখ না থাকলে বা একটি চোখে বেশি কম দেখলে ঐ সকল প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয় না। সেজন্যে নিরাপদ ড্রাইভিং এর জন্য এক চোখে গাড়ী চালানো ঠিক নয়। বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যবশত: অনেক গাড়ী চালক আছেন যারা এক চোখে দেখেন না। এদের গাড়ী চালাবার সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

**প্রশ্ন : চশমা বানাবার পর তা কি আবার চক্ষু বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত?**

উত্তর : হ্যাঁ। চশমা বানাবার পর আবারো তা পরীক্ষা করানো উচিত।

চশমা আসলে একটি জটিল বিষয়। চশমা দেবার সময় কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা বা ম্যানুয়াল চক্ষু পরীক্ষা করে আবার রোগীকে অক্ষর পড়িয়ে পাওয়ার কনফার্ম

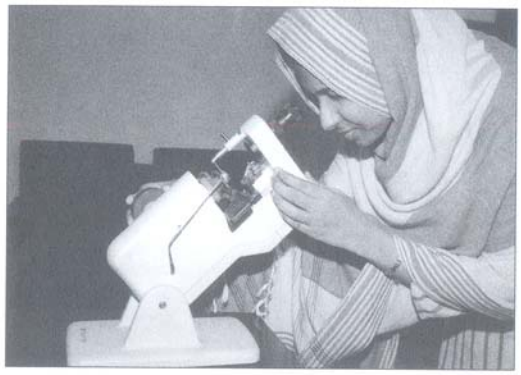

করা হয়। ঐ পাওয়ারটি চশমার প্রেসক্রিপশনে লেখা হয়। চশমার দোকানে ঐ প্রেসক্রিপশন দেখে পাওয়ার তৈরী করেন এবং ফিটিং এর জন্য পাঠান। সুতরাং এতগুলো ধাপ পার হয়ে আসার সময় কোথাও কোন ভুল হলো কিনা সেটা দেখার জন্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ বা তাঁর কোন সহযোগীকে দিয়ে পাওয়ার মাপার যন্ত্র 'লেন্সমিটার' এ পরীক্ষা করা উচিত।

**প্রশ্ন : চশমা একবার পরলে তা কি আবার ছাড়া যায়?**

উত্তর : অনেকেই মনে করেন- চশমা একবার পরলে আর ছাড়া যায় না। আসলে কার চশমা লাগবে, কখন ছাড়া যাবে- এসবই নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির পাওয়ার এর উপর। অনেক শিশুকে ছোটবেলায় মাথা ব্যথার জন্য সামান্য পাওয়ার দেয়া হয়। কিছুদিন ব্যবহারের পর তা নাও লাগতে পারে। অনেক শিশুর ছোটবেলায় প্লাস পাওয়ার লাগতে পারে, বড় হতে হতে তার ঐ পাওয়ার আর নাও লাগতে পারে। বেশিরভাগ শিশুই স্কুলে গিয়ে প্রথম ধরা পড়ে- দূরে ব্লাকবোর্ড দেখতে পারছে না। এদেরকে মাইনাস পাওয়ার দেবার প্রয়োজন হয়। এরা যত বড় হবে- শরীরের

সাথে সাথে চোখের আয়তনও বড় হয়। তখন চোখের পাওয়ারও স্বাভাবিক এর তুলনায় বেড়ে যায়। এদেরকে তখন ভালো দেখতে গেলে অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া পাওয়ার মাইনাস করতে হয় এবং চশমা অনেকদিন পড়ার প্রয়োজন হয়।

শিশু হোক বা বড় হোক, চোখ পরীক্ষা করে পাওয়ার এর প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। তা না হলে চোখের রেটিনার উন্নতি হবে না এবং ৬/৬ দৃষ্টি তৈরী হবে না।

**প্রশ্ন : কন্টাক্ট লেন্স কি চোখের জন্যে ক্ষতিকর?**

উত্তর : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করে এবং নিয়ম মেনে চললে কন্টাক্ট লেন্স চোখের জন্য ক্ষতিকর নয়।

আমাদের দেশে অনেকেই আছেন উপযুক্ত পরীক্ষা না করেই চশমার দোকান থেকে কন্টাক্ট লেন্স নিয়ে ব্যবহার করেন এবং অনেক সময় নানা সমস্যা নিয়ে

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য আসেন। ধরা যাক একজন রোগীর চোখের পানির পরিমাণ কম। তাকে পরীক্ষা না করেই দোকান থেকে কন্টাক্ট লেন্স দেয়া হলো। ২/১ দিনের মধ্যেই ঐ রোগীর চোখে কর্ণিয়ায় আলসার বা ক্ষত হয়ে যাবে এবং সঠিক চিকিৎসা না হলে দৃষ্টির ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

আজকাল অনেক উচ্চ পানি ধারণ ক্ষমতাসহ কন্টাক্ট লেন্স পাওয়া যায় যা চোখের

জন্য আরামদায়ক। এছাড়া কিছু ডিসপোজঅ্যাবল কন্টাক্ট লেন্স আছে যা মাত্র ১-২ মাস ব্যবহার করে ফেলে দেয়া হয়- যার ফলে চোখের কোন জটিলতা হয় না বললেই চলে।

**প্রশ্ন : কন্টাক্ট লেন্স একবারে কতদিন চোখে রাখা যায়?**

উত্তর : সাধারণ কন্টাক্ট লেন্সগুলি দিনের বেলা চোখে পরা হয় এবং রাত্রে ঘুমের পূর্বে নির্দিষ্ট কেসের মধ্যে খুলে রাখা হয়। লেন্সের প্রকারভেদে ১২-১৬ ঘন্টা পর্যন্ত এই লেন্স পরে থাকা যায়।

এক্সটেন্ডেড ওয়ার কন্টাক্ট লেন্স (Extended wear contact lens) নামে এক ধরনের কন্টাক্ট লেন্স পাওয়া যায়- যাতে পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। এসব কন্টাক্ট লেন্স একবার চোখে লাগিয়ে ৭-১৪ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। এর বেশি রাখলে চোখের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

১-২ সপ্তাহ পর ঐ লেন্সগুলি ফেলে দিতে হয় বলে বছরে অনেক সংখ্যক কন্টাক্ট লেন্স এর প্রয়োজন হয় এবং লেন্সের মূল্যও অনেক বেড়ে যায়। আমাদের দেশে এই জাতীয় লেন্সের ব্যবহার অনেকটা সীমিত।

চোখের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করলে ডেইলি ওয়ার লেন্স বা দৈনিক রাত্রে খুলে রাখার লেন্সই ভালো।

**প্রশ্ন : রঙিন কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারে চোখে কোন অসুবিধা হয় কি?**

উত্তর : সাধারণ কন্টাক্ট লেন্সের উপরে এক ধরনের রং করে রঙিন কন্টাক্ট লেন্স তৈরী করা হয়ে থাকে।

যেহেতু রং একটি কেমিক্যাল, এ জন্যে অনেকের চোখে ঐ রং এর জন্য এলার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

যারা সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য রঙিন কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য

প্রথম কয়েকদিন ট্রায়াল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন সমস্যা না হলে তখন ঐ ব্রান্ডের কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

যাদের চোখে পাওয়ার আছে তাদের জন্য প্রথমে সাধারণ কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে- ২য় ধাপে রঙিন + পাওয়ার-কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

**প্রশ্ন : অল্প আলোতে পড়লে কি চোখের ক্ষতি হয়?**

উত্তর : অল্প আলোতে পড়লে চোখের কোন ক্ষতি হয় না। তবে কোন কিছু দেখা

না গেলে, জোর করে পড়ার চেষ্টা করলে চোখের উপর চাপ পড়ে বা আইস্ট্রেন হয়। কিছুক্ষণ এভাবে পড়লে মাথা ব্যথা বা চোখে ব্যথা হতে পারে। সুযোগ থাকলে স্বাভাবিক আলোতে পড়াশুনা করাই শ্রেয়।

**প্রশ্ন : আমার চোখে চশমা লাগলে কি আমার বাচ্চাদেরও লাগবে?**

উত্তর : হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই লাগতে পারে। বিশেষ করে আপনার যদি নিকট দৃষ্টি বা মায়োপিয়া থাকে তাহলে আপনার ছেলেমেয়ে কারও কারও ঐ একই সমস্যা হতে পারে।

আপনি যদি এমন কাউকে বিয়ে করেন যার আপনার মতই চশমা লাগে কিংবা আপনার বংশের কাউকে বিয়ে করেন তাহলে আপনাদের ছেলেমেয়েদের চশমা লাগার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে।

**প্রশ্ন : অলস চোখ কাকে বলে?**

উত্তর : যখন একটি সুস্থ্য চোখে চশমা দিয়ে বা কন্টাক্ট লেন্স এর সাহায্যে ভালো দেখা যায় না তখন তাকে অলস চোখ (lazy eye) বলা হয়। সাধারণত: শিশুর ৭ বছর বয়সের পূর্বে যদি চোখ ট্যারা থাকে, ছানি থাকে, চোখের পাওয়ার থাকে বা অন্য কোন কারণে চোখে সঠিকভাবে আলো প্রবেশ করতে না পারে তাহলে ঐ চোখের রেটিনার সঠিক বিকাশ লাভ সম্ভব হয় না এবং চোখ অলস হয়ে যায়। অনেক শিশু মনে করে- হাত যেমন একটিই বেশি শক্তিশালী (যেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডান হাত) তেমনি চোখের দেখাও একটিতে ভালো দেখা যাবে- অন্যটিতে কম দেখা যাবে। এ কারণে তারা দেখার সমস্যার কথা পিতা-মাতাকে বলে না। এসব কারণে- কোন সমস্যা না থাকলেও স্কুলে ভর্তির সময় সকল শিশুর চোখ পরীক্ষা করানো উচিত।

**প্রশ্ন : চোখের গ্লকোমা কাকে বলে ?**

উত্তর : রক্তের যেমন চাপ আছে তেমনি চোখেরও একটি নির্দিষ্ট চাপ রয়েছে। চোখের চাপ ১০-২০ মি.মি. মারকারী। কোন কারণে চোখের চাপ বেড়ে গেলে চোখের অপটিক নার্ভের ক্ষতি হয় এবং খুব ধীরে ধীরে নার্ভটি শুকিয়ে যায়, দৃষ্টির পরিসীমা কমতে কমতে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ রোগের মারাত্মক দিক হচ্ছে- রোগটি উপসর্গহীন এবং অপরিবর্তনীয়। একবার অন্ধত্ব হয়ে গেলে তা ভালো করা যায় না।

গ্লকোমার অনেক প্রকারভেদ আছে। উপরে বর্ণিত গ্লকোমাকে বলা হয় প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা (Primary Open Angle Glaucoma-POAG) এছাড়া প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা (Primary Angle Closure Glaucoma-PACG) স্বাভাবিক চাপ গ্লকোমা (Normal Tension Glaucoma) সেকেন্ডারী গ্লকোমা (Secondary Glaucoma) জন্মগত গ্লকোমা ইত্যাদি নানা ধরনের গ্লকোমা রোগ আছে।

গ্লকোমা যেহেতু সাধারণত: ২ চোখেরই রোগ সেজন্যে এক চোখে সমস্যা দেখা গেলেও অন্য চোখেরও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হবে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ গ্লকোমা সন্দেহ করলে চোখের চাপ, চোখের ভিতরে অপটিক নার্ভ, দৃষ্টির পরিসীমা (Visual Field Analysis) ইত্যাদি কয়েকটি প্রাথমিক

পরীক্ষা করেন। প্রয়োজন হলে আরো কয়েকটি আধুনিক ইমেজিং পরীক্ষা যেমন ও.সি.টি, এইচ.আর.টি. প্যাকিমেট্রি, ফান্ডাস ফটোগ্রাফি, ইউ.বি.এম ইত্যাদি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন ধরনের গ্লকোমার উপসর্গ এবং চিকিৎসারও তারতম্য রয়েছে। চক্ষু ও গ্লকোমা বিশেষজ্ঞ এই রোগটির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে চোখের ফোটা ওষুধ, খাবার ওষুধ, চোখের লেজার কিংবা অপারেশন বা সবগুলি একত্রে প্রয়োজন হতে পারে।

যত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যাবে ততটাই চোখের অপটিক নার্ভের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে। রোগটিকে বুঝবার জন্য রোগীকে গ্লকোমা রোগ সম্পর্কে বই, পত্র পত্রিকা বা ইন্টারনেটে পড়তে হবে।

**প্রশ্ন : চোখের ছানি বলতে কি বোঝায় ?**

উত্তর : চোখের ভেতরে একটি লেন্স থাকে- যার সাহায্যে আলোকে ফোকাস করে রেটিনায় পতিত হয় এবং আমরা দেখতে পারি। এই লেন্স এবং লেন্সের আবরণ (ক্যাপসুল) যদি বয়সজনিত কারণে প্রদাহ, ডায়াবেটিস বা অন্য কোন রোগের কারণে বা আঘাতে ঘোলা হয়ে যায়- তাকে চোখের ছানি বলে। সামান্য ঘোলা হলে তাকে অপরিপক্ক ছানি (Immatare cataract) বলা বলা হয় এবং পরিপুর্ণ ঘোলা হলে- পক্ক ছানি (Mature Cataract) বলা হয়।

চোখের ছানির প্রধান কারণ- বয়সজনিত। এই প্রকার ছানিকে বলা হয় সেনাইল ক্যাটারাক্ট।

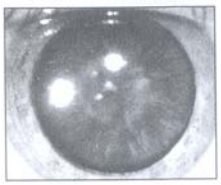

প্রথম অবস্থায় এই ছানি পড়লেও চশমার পাওয়ার পরিবর্তন করে দৃষ্টিশক্তির উন্নতি করা সম্ভব, কিন্তু একটি সময়ে তাও সম্ভব হয় না। তখন অপারেশন এর মাধ্যমে ঐ ঘোলা লেন্সটির অপসারণ করে কৃত্রিম লেন্স বসানো হয়।

কোন ওষুধের মাধ্যমে ছানিকে সরানো যায় না। সুতরাং অপারেশনই হল চোখের ছানির একমাত্র চিকিৎসা। তবে অপারেশন এবং কৃত্রিম লেন্সের মধ্যে অনেক প্রকারভেদ রয়েছে।

**প্রশ্ন : ফ্যাকো সার্জারী কি?**

উত্তর : ফ্যাকো শব্দটি ইংরেজী Phacoemulsification শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ফ্যাকোইমালসিফিকেশন শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে লেন্স গলানো। অর্থাৎ ছানি অপারেশনে যে পদ্ধতিতে চোখের লেন্সকে টুকরো টুকরো করে- গলিয়ে অপসারণ করা হয় সেটাই হলো ফ্যাকো সার্জারী।

আমাদের চোখের লেন্স এর পরিমাপ প্রায় ৯ মিলিমিটার। সুতরাং সাধারণ অপারেশনে (Extra Capsular Cataract Extraction-ECCE) চোখের পাশে প্রায় ৯ মিলিমিটার কেটে ঐ লেন্সটি একবারেই বের করা হয় এবং পরে একটি

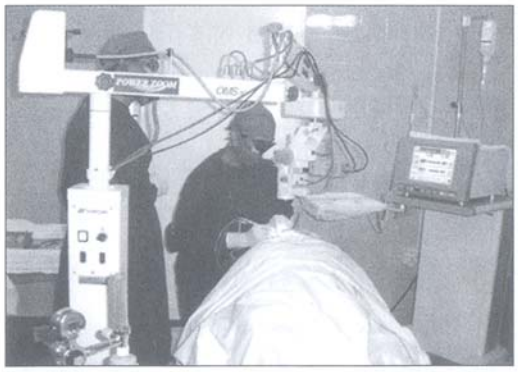

শক্ত কৃত্রিম লেন্স সংযোজন করা হয়। যেহেতু অনেক বেশি কাটা হয়- সেজন্যে এখানে ৫-৭ টি সেলাই দেবার প্রয়োজন হয়।

ফ্যাকো সার্জারী বর্তমানে চোখের ছানি অপারেশন এর আধুনিক পদ্ধতি। এখানে চোখের পাশে ২-৩ মিমি আকারে একটি টানেল করা হয় এবং ফ্যাকো মেশিনের সাহায্যে ঐ ৩ মি.মি. ছিদ্র এর মধ্য দিয়ে লেন্সটিকে ৪ থেকে ৮ টুকরা করা হয়

এবং তা গলিয়ে অপসারণ করা হয়। এরপর একটি নরম লেন্স বা ভাজ করা যায় এমন কৃত্রিম লেন্স (Foldable IOL) সঠিক অবস্থানে সংযোজন করা হয়ে থাকে। ছিদ্রটি খুব ছোট বিধায় এখানে সেলাই করার প্রয়োজন হয় না। চোখের ভেতরের স্বাভাবিক চাপেই ঐ ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

ফ্যাকো সার্জারীর পর রোগী হাটাচলা করতে পারেন, এ জন্যে আজকাল ফ্যাকো সার্জারী করে রোগীরা বাড়ী চলে যেতে পারেন।

এই অপারেশনে ক্ষত খুব সামান্য হয় বিধায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষত শুকাতে সময় কম লাগে।

ফ্যাকো সার্জারীর একটি অসুবিধা হচ্ছে ছানি বেশি পেকে গেলে বা লেন্সটি বেশি শক্ত হয়ে গেলে মেশিনের সাহায্যে লেন্সটি গলানো কঠিন হয় এবং জটিলতার হার বেড়ে যায়। সেজন্যেই কেউ ফ্যাকো সার্জারী করার চিন্তা করলে লেন্স বেশি শক্ত হবার আগেই তা করানো উচিত।

**প্রশ্ন : ছানি অপারেশন এর পর কোন কৃত্রিম লেন্স সবচেয়ে ভালো ?**

উত্তর : 'কৃত্রিম লেন্স' নানা প্রকার পাওয়া যায়। শক্ত কৃত্রিম লেন্স পি.এম.এম.এ নামক পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। নরম কৃত্রিম লেন্স সাধারণত: হেমা বা অ্যাকরাইলিক বস্তু দিয়ে তৈরী হয়। কিছু লেন্স আছে হাইড্রোফোবিক আবার কিছু হাইড্রফিলিক। এসব গুণাবলীর কারণে লেন্সের মূল্যেরও অনেক পার্থক্য হয়।

ই.সি.সি.ই বা এসআইসিএস পদ্ধতিতে ছানি অপারেশন করলে শক্ত কৃত্রিম লেন্স দেয়া হয়। এই লেন্সগুলোর দাম কম, অপারেশন-এর খরচও তুলনামূলক কম।

ফ্যাকো সার্জারী করলে অপারেশন এর ৩ মি.মি. ছিদ্র দিয়েই ভাজ করা যায় এমন নরম লেন্স বিশেষ ধরনের ইনজেকটার দিয়ে চোখে প্রবেশ করানো হয়। এতে করে প্রাথমিক ছিদ্র আর বড় করতে হয় না। ফ্যাকো সার্জারী করে শক্ত লেন্স দিতে চাইলে ছিদ্রটিকে অবশ্যই লেন্সের সমান আকারে বড় করে নিতে হবে। এতে অবশ্য ফ্যাকো সার্জারীর সুবিধা অনেকটা ব্যহত হবে।

চোখের লেন্স কয়েক বছর চোখে থাকলে- লেন্সের পেছনের পর্দা আবার কিছুটা ঘোলা হয়ে যেতে পারে। তখন ইয়াগ লেজারের সাহায্যে ঐ ঘোলা পর্দার কেন্দ্রটি কেটে পরিস্কার করতে হয়। হাইড্রোফোবিক নরম লেন্স ব্যবহার করলে পর্দা ঘোলা হবার হার অনেক কমে যায়।

উপরে বর্ণিত সব লেন্সই মোনোফোকাল লেন্স। অর্থাৎ অপারেশন এর পর রোগী দূরে বা কাছে ভালো দেখবেন। দূরে ভালো দেখলে- কাছে দেখার জন্য রিডিং গ্লাস বা চশমা পরতে হবে। এক প্রকার কৃত্রিম লেন্স এখন পাওয়া যায়- যার নাম 'মাল্টিফোকাল কৃত্রিম লেন্স। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই লেন্স সংযোজন করলে রোগী দূরে ও কাছে ভালো দেখবেন এবং সাধারণত: শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর কোন চশমার প্রয়োজন হয় না।

**প্রশ্ন : চোখ শুষ্ক হয় কেন ?**

উত্তর : চোখকে সুস্থ্য ও সতেজ রাখার জন্য প্রয়োজন চোখের পানি। চোখের কোটরে অবস্থিত প্রধান ল্যাকরিমাল গ্লান্ড ও চোখের অতিরিক্ত ল্যাকরিমাল গ্লান্ড থেকে এই পানি তৈরী হয়ে চোখের উপরের অংশকে সব সময় ভেজা ও মসৃণ রাখে। কোন কারণে চোখের পানি তৈরী কম হলে কিংবা এই পানির গুণগত মান এর পরিবর্তন হলে চোখ শুকিয়ে যায়। এছাড়া চোখে এসিড বা চুন পড়লে, কয়েকটি ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, চোখের আঘাত, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে অনেকক্ষণ থাকলে, খাবার অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে, কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চোখের পানি কমে যেতে পারে এবং চক্ষুশুষ্কতা হতে পারে।

চক্ষু শুষ্কতার চিকিৎসা বেশ জটিল। অনেক রোগীকেই সারা জীবন চিকিৎসা করতে হয়। যেসব ক্ষেত্রে শুষ্কতার কারণ জানা সম্ভব সেখানে কারণগুলির প্রতিরোধ বা প্রতিকার করে চোখের কৃত্রিম পানি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চক্ষু শুষ্কতার কারণ বোঝা যায় না। সেক্ষেত্রে ঘনঘন চোখের কৃত্রিম পানি- ফোটা ওষুধ ব্যবহার করলে চোখের কষ্ট লাঘব হবে এবং আরাম অনুভূত হবে।

**প্রশ্ন : ডায়াবেটিসে চোখের কি কি জটিলতা হয় ?**

উত্তর : ডায়াবেটিস রোগে চোখে মারাত্মক জটিলতা হতে পারে। সঠিক সময়ে চিকিৎনা না হলে ডায়াবেটিস জটিলতায় চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চোখের প্রায় সকল অংশই ডায়াবেটিসের জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারে। যেমন-

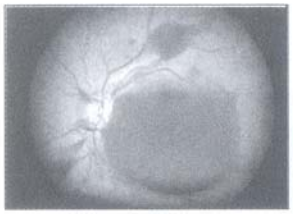
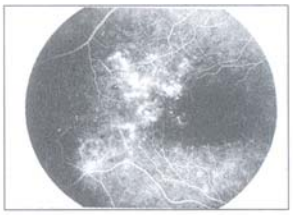
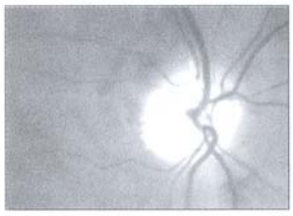
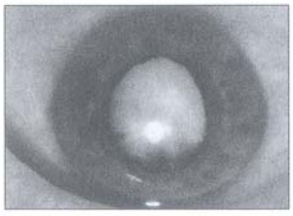

ঘন ঘন চোখের পাতার ইনফেকশন, কর্ণিয়ায় ক্ষত, চোখের পানির গুণগত পরিবর্তন, চোখের পাওয়ার এর ঘন ঘন পরিবর্তন, অল্পবয়সে চোখে ছানি পড়ে যাওয়া, গ্লকোমা বা চোখের প্রেসার রোগের হার বেড়ে যাওয়া, অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যাওয়া, রেটিনায় ও ভিট্রিয়াস এ রক্তক্ষরণ হয়ে রেটিনার ডিটাচমেন্ট বা এক ধরনের জটিল গ্লকোমা-নিওভাসকুলার গ্লকোমা হতে পারে।

অপটিক স্নায়ু ও রেটিনার জটিলতায় রোগীরা আস্তে আস্তে দৃষ্টি হারাতে থাকেন এবং এসময় লেজার এর সাহায্যে রেটিনার চিকিৎসা না করালে সাধারণত রোগী অন্ধ হয়ে যান।

**প্রশ্ন : ডায়াবেটিসে লেজার করলে কি চোখ ভালো হয়ে যায় ?**

উত্তর : ডায়াবেটিস রোগে চোখের মারাত্মক জটিলতা যেমন- রেটিনার রক্তক্ষরণ হলে বা রেটিনার রক্তনালী বন্ধ হয়ে গেলেই লেজার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

লেজার শব্দের অর্থ-Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. লেজার রশ্মির সাহায্যে আলোক শক্তিকে চোখের পিগমেন্টস এর সাথে শোষণ করিয়ে তা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। চোখের রেটিনার বা অন্য কোন স্থানে এই লেজার এর সাহায্যে যে দাহ করা হয় তাকে বলে থেরাপিউটিক বার্ন।

সুতরাং লেজার একটি ধ্বংসাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতি। ডায়াবেটিসের কারণে রেটিনার যে সকল জায়গায় রক্তশূন্যতা বা রক্তাল্পতা হয় সেখান থেকে

অপরিকল্পিত নতুন রক্তনালী তৈরীর সম্ভাবনা থাকে ও চোখের ভেতরে রক্তপাত ঘটায়। লেজার এর সাহায্যে ঐ এলাকায় বার্ন করা হলে সেখান থেকে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা কমে যায় এবং নতুন জটিলতার সম্ভাবনা কমে যায়।

সুতরাং ডায়াবেটিসে লেজার করলে চোখের বর্তমান দেখার উন্নতি নাও হতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের আরো মারাত্মক জটিলতা থেকে প্রতিরোধ করে বা অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করে।

**প্রশ্ন : চোখের লেজার বলতে কি বুঝায় ?**

উত্তর : লেজার একটি ইংরেজী শব্দ LASER যা Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation এর সংক্ষিপ্ত রূপ। লেজার এর সাহায্যে শরীরের নানা রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

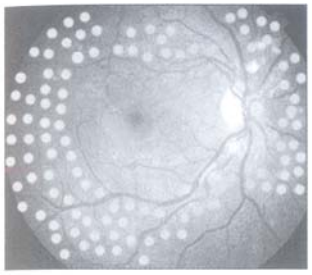

চোখের নানা রোগ ও কয়েকটি রোগের জটিলতায় লেজার রশ্মির ব্যবহার হচ্ছে। লেজার নানা ধরনের এবং এদের কার্যকারিতাও ভিন্ন। চোখের জন্য আরগন লেজার, ডায়ড লেজার, ইয়াগ লেজার, এক্সাইমার লেজার ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে।

আজকাল পত্রপত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় চশমার পরিবর্তে ল্যাসিক করুন। ল্যাসিক ও এক ধরনের লেজার যা এক্সাইমার লেজার এর সাহায্যে করা হয়ে থাকে। যাদের চোখে পাওয়ার আছে- এই লেজার এর সাহায্যে তা কমিয়ে শূন্য করা সম্ভব। ২০-৪০ বছর বয়সী রোগীদের জন্য এই পদ্ধতি বেশি সফল।

ডায়াবেটিসের জটিলতা থেকে চোখের অন্ধত্ব প্রতিরোধে আরগন লেজার বা ডায়ড লেজার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ্লকোমা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য আরগন লেজার, ইয়াগ লেজার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন : 'চোখের প্রেসার' বলতে কি বুঝায় ?**

উত্তর : চোখের আর একটি নাম অক্ষিগোলক। গোলাকার এই চক্ষু একটি নির্দিষ্ট আয়তনের। খুব ছোট শিশু ছাড়া চক্ষুগোলকের আয়তন বড় হতে পারে না।

এই অক্ষিগোলকের অনেক অংশই আমাদের দৃষ্টির প্রখরতার জন্য স্বচ্ছ থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য চোখের কয়েকটি অংশ যেমন- কর্ণিয়া, লেন্স, ভিট্রিয়াস এ সরাসরি রক্ত সরবরাহ নেই। এইসব অংশে অক্সিজেন সরবরাহ এর জন্য রক্ত থেকে চোখে তৈরী হয় এক ধরনের তরল পদার্থ যার নাম অ্যাকুয়াস হিউমার।

এই অ্যাকুয়াস হিউমার চোখের একদিকে তৈরী হচ্ছে এবং অন্যদিক (চোখের কোন্) দিয়ে বেরিয়ে আবার রক্তে মিশে যায়। এই তরল পদার্থ দিয়েই চোখের

অভ্য-রীণ একটি চাপ তৈরী হয়- যার নাম চোখের প্রেসার বা (Intra Ocular Pressure, IOP)

কোন কারণে অ্যাকুয়াস বেশি তৈরী হলে কিংবা চোখ থেকে বেরিয়ে যাবার পথে বাধার সৃষ্টি হলে চোখের অভ্য-রীণ চাপ বেড়ে যায়। চোখের এই চাপ বাড়লে চোখের অপটিক নার্ভের ক্ষতিসাধন করে এবং 'গ্লকোমা' রোগের উৎপত্তি হয়।

**প্রশ্ন : হঠাৎ চেখে ময়লা পড়লে কি করবো ?**

উত্তর : আমাদের স্বাভাবিক চলাফেরার সময়ে অনেকের চোখে ময়লা পড়তে পারে। এছাড়া দুষ্কৃতিকারী, ছিনতাইকারী চোখের মধ্যে ময়লা, মলম, মরিচের গুড়া ঘষে দেয়। অনেকের চোখে এসিড নিক্ষেপ করা হয়।

চোখে যে কোন ধরনের ময়লা পড়লে তা একটি জরুরী বিষয়। সংগে সংগে ব্যবস্থা না নিলে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

চোখের ময়লা পড়ার সংগে সংগে নিজে বা কাউকে দিয়ে দৃশ্যত কোন ময়লা ফেলে দিতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণ পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে। এরপর চোখে একটি অ্যান্টিবায়োটিক ফোটা ওষুধ দিনে ৫/৬ বার দিতে হবে।

যাদের চোখে এসিড বা চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে ক্ষত হয়- তা আরো মারাত্মক। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে চিকিৎসা নিতে হবে।

চোখের ভেতরে কাচ বা শক্ত কোন বস্তুর আঘাতে অক্ষিগোলকের ক্ষতি হতে

পারে, কেটে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ চোখের ভিতর ওষুধ দিয়ে চোখের পটি লাগিয়ে দিতে পারেন এবং কোন কোন সময়ে চোখের অপারেশন এরও প্রয়োজন হতে পারে।

**প্রশ্ন : আমার 'গ্লকোমা' রোগ আছে কিনা বুঝবো কিভাবে ?**

উত্তর : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্তত: প্রাথমিক অবস্থায় আপনার গ্লকোমা আছে কিনা আপনি বুঝতে পারবেন না। 'গ্লকোমা' রোগ অত্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেলে চোখের দৃষ্টি ও দৃষ্টির পরিসীমা অনেক কমে যায়, আর তখন রোগীরা বুঝতে পারেন। এই জাতীয় গ্লকোমাকে বলা হয়- প্রাথমিক এঙ্গেল খোলা গ্লকোমা।

অন্য ধরনের গ্লকোমা- যেমন- প্রাথমিক এঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা, জন্মগত গ্লকোমা ও সেকেন্ডারী গ্লকোমাতে অনেক উপসর্গ থাকে এবং রোগগুলি তুলনামূলক তাড়াতাড়ি রোগনির্ণয় সম্ভব হয়।

প্রাথমিক এঙ্গেল খোলা গ্লকোমাতে সাধারণত: কোন উপসর্গ থাকে না এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞরাই নির্ণয় করে থাকেন। চোখের প্রেসার যদি স্বাভাবিক ১০-২০ মিমি মারকারীর বেশি হয়, চোখের ভিতরে অপটিক নার্ভের অস্বাভাবিক পরিবর্তন থাকে

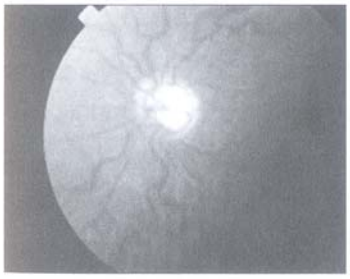

এবং দৃষ্টির পরিসীমায় (Visual Field) পরিবর্তন থাকে তাহলে আপনার গ্লকোমা হবার সম্ভাবনা আছে। এরপর আরও কয়েকটি বিশেষ পরীক্ষা যেমন চোখের কোন্ পরীক্ষা (Gonioscopy) কর্ণিয়ার পূরত্ব (Central Corneal Thickness) ও.সি.টি,এইচ,আর,টি, ইউ,বি.এম ইত্যাদি নানা ধরনের আধুনিক পরীক্ষার সাহায্যে আপনার গ্লকোমা এবং তার প্রকারভেদ নিশ্চিত করা হয়।

**প্রশ্ন : আমার চোখে 'ম্যাকুলার ডিজেনারেশান' আছে কিনা বুঝবো কিভাবে ?**

উত্তর : 'ম্যাকুলা' হচ্ছে চোখের রেটিনার কেন্দ্রে অবস্থিত ৫.৫ মি.মি. আয়তনের সবচেয়ে সংবেদনশীল স্থান। আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির জন্যে, এই 'ম্যাকুলা'র সুস্থ্য থাকা দরকার। বয়স বাড়ার সাথে সম্পর্কিত এই ম্যাকুলার কোষে পরিবর্তন হয়

বা ডিজেনারেশন হয়- যার নাম 'ম্যাকুলার ডিজেনারেশান' বা (Age Related Macular Degeneration, ARMD)

সাধারণত: ৫০-৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মাঝে এই রোগ শুরু হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই রোগের হারও বাড়তে থাকে। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন দুই ধরনের হয়ে থাকে। শুকনা ও ভেজা ধরনের (Dry & Wet type-ARMD)

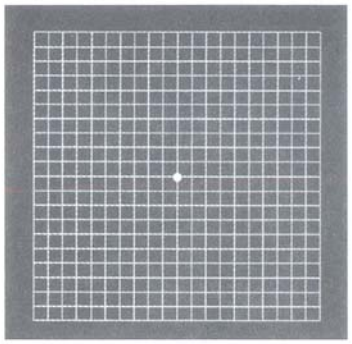

রোগীদের দৃষ্টি আস্তে আস্তে কমতে থাকে। সাধারণত: দুই চোখই আক্রান্ত হয় তবে আগে- পিছে হতে পারে। দেখার মধ্যখানে কালো স্পট আসতে পারে- বস্তুগুলি- আঁকাবাঁকা বা ছোট, বড় দেখা যেতে পারে। ছবির চার্টের (Amsler grid chart) দাগগুলি বাঁকা মনে হতে পারে। লেখাপড়া করতে সমস্যা হয়। গাড়ীর আলো চোখে পড়লে- বা অন্য কোন শক্তিশালী আলো চোখে পড়লে- চোখ ঘোলা হয়ে যেতে পারে।

ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এর চিকিৎসার সফলতা কম। শুকনা ধরনের ক্ষেত্রে এখনও কোন চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না তবে ভেজা ধরনের ডিজেনারেশনে চোখের ভেতরে এক ধরনের লেজার এবং ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করলে অনেক ক্ষেত্রেই ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। এই চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় বাংলাদেশে এর প্রচলন এখনও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

**প্রশ্ন : আমরা কিভাবে দেখি ?**

উত্তর : আমাদের চারিপাশের যা কিছুকেই আমরা দেখি তা আসলে ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করবার জন্য। চোখ বন্ধ করলে বা অন্ধকারে সেই জন্য আমরা দেখতে পাই না। কোন বস্তু থেকে আলো চোখে পড়লে তা চোখের প্রতিসরণক্ষম মাধ্যম (Refractive Media) যেমন কর্ণিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স এবং ভিট্রিয়াস এর মধ্য দিয়ে রেটিনাতে পৌছে। এসকল প্রতিসরণক্ষম মাধ্যম বিশেষত লেন্সের কাজ হচ্ছে আগত আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে ফোকাস করা। স্বাভাবিক চোখে কোন বস্তু থেকে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে পড়ে ও স্বাভাবিক দেখা যায়। যাদের চোখের ঐ প্রতিসরণক্ষম কোন মাধ্যম-এর প্রতিসরণ ক্ষমতা কম

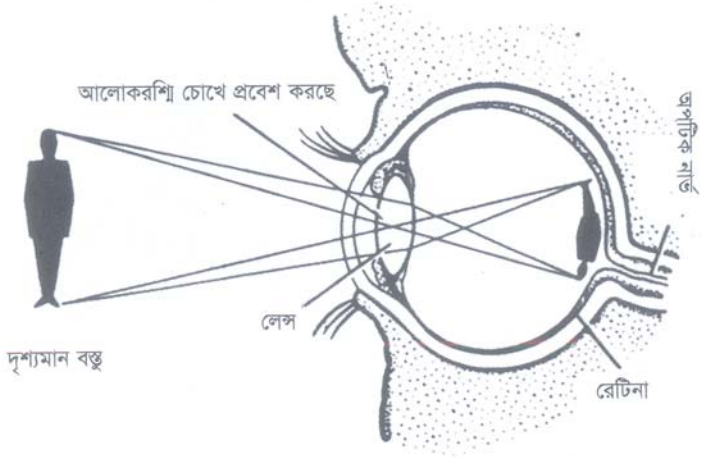


ছবিতে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনায় উল্টো আকারে পতিত হয়েছে

বা বেশি থাকে তাদের চোখে আলোকরশ্মি রেটিনার যথাক্রমে পেছনে বা সামনে পতিত হয়। এসব ক্ষেত্রে চোখের সামনে প্রয়োজনীয় পাওয়ার-এর চশমা দেয়া হলে আলোকরশ্মি ঠিক রেটিনাতে পতিত হয়ে ভালো দেখতে সাহায্য করে।

খালি চোখে কিংবা চশমা দিয়ে দেখার সময় কোন বস্তু থেকে আলোকরশ্মি লেন্সের মাধ্যমে রেটিনাতে উল্টো আকারে পতিত হয়। যেমন একজন দাঁড়ানো মানুষের ছবি রেটিনাতে এমনভাবে পড়ে যে তার মাথা নিচের দিকে ও পা ওপরের দিকে থাকে। আলোকরশ্মি রেটিনাতে পতিত হবার পর সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ-এর সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হয়ে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয় এবং অপটিক স্নায়ু (Optic nerve) দিয়ে এই উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছে। মস্তিষ্কের দৃষ্টির কেন্দ্রে পৌঁছার পর আমরা উল্টো বস্তুকে সোজাভাবে দেখতে পাই। যেমন একজন দাঁড়ানো মানুষকে দাঁড়ানোই দেখতে পাই।

**প্রশ্ন : চোখের পাতায় কি উকুন হতে পারে ?**

উত্তর : চোখের পাতায় উকুন হতে পারে বা থাকতে পারে। যারা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেন তাদের তলপেটের নিম্নাংশ থেকে 'থাইরাস পিউবিস' নামক এক প্রকার উকুন শরীরের অন্যান্য চুলের ভেতর যেমন- বুকে, বগলে বা চোখের পাতার মধ্যে চলে আসতে পারে।

ছোট শিশুদের চোখের পাতায় চুলের মধ্যে 'থাইরিঅ্যাসিস পালপিরাম' নামক এক ধরনের উকুন পাওয়া যায়।

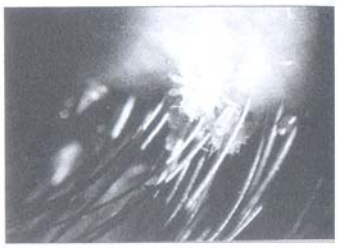

চোখের পাতায় এসব উকুন থাকলে চোখের পাতায় ক্ষত সৃষ্টি করে রক্তক্ষরণ হয়। চোখের চুলকানি ও অস্বস্তি লেগেই থাকে এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে চোখের কর্ণিয়াসহ নানা অংশে প্রদাহ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কারও চোখের পাতায় উকুন পাওয়া গেলে ঐ পরিবারের সবাইকে পরীক্ষা করতে হবে। যাদের চোখে বা দেহের অন্য অংশে উকুন পাওয়া যাবে তাদের সবাইকেই উপযুক্ত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যজ্ঞান দিতে হবে।

**প্রশ্ন : চোখ তুলে ফেলার পর কি কারও দান করা ভালো চোখ লাগানো যায় ?**

উত্তর : অনেকেই মনে করেন- চোখ তুলে ফেলে অন্য কারো ভালো চোখ লাগালে আবার দেখা যেতে পারে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। চোখ তুলে ফেলে দিলে- কখনও আর ঐ চোখে দেখার সুযোগ নেই।

চক্ষু দান বলতে আমরা বুঝি- কর্ণিয়া দান। চোখের সামনে যে নেত্রস্বচ্ছ বা কর্ণিয়া থাকে- তা অনেক কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন মৃত কোন ব্যক্তির কর্ণিয়া এনে ঐ চোখে সংযোজন করা যায়। এই পদ্ধতির নাম-কেরাটোপ্লাস্টি। গৃহিত ব্যক্তির যদি চোখের ভেতরে রেটিনা, লেন্স ও অন্যান্য অংশ ভালো থাকে তাহলেই কর্ণিয়া সংযোজন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চোখ তুলে ফেলার মাসখানেক পর ঐ চোখের কোটরে কৃত্রিম পাথরের চোখ লাগানো যেতে পারে- তাতে সৌন্দর্য বর্ধক হবে কিন্তু চোখে দেখার কোন সম্ভাবনাই নেই।

**প্রশ্ন : চোখ লাল হয় কেন ?**

উত্তর : চোখের সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা 'লাল চোখ'। চোখের এলার্জি, ক্ষত, প্রদাহ, গ্লকোমা ইত্যাদি নানা কারণে চোখ লাল হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাল চোখ মারাত্মক সমস্যা নয়। সাধারণ চোখ ওঠা, চোখের

এলার্জিতে চোখ লাল হয়। চোখের অস্বস্তি ও চুলকানো প্রধান সমস্যা। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য আলোভিতি হতে পারে। চোখে দেখার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। চোখের অ্যান্টিবায়োটিক ফোঁটা দিনে ৫/৬ বার ব্যবহার করলে সাধারণ চোখ ওঠা ভালো হয়ে যায়। চোখের এলার্জির জন্য প্রকারভেদে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় খাবার ওষুধ ও ফোটা ওষুধ এবং স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

কর্ণিয়ায় ক্ষত, আইরাইটিস, ইউভিয়াইটিস, গ্লকোমা ইত্যাদি মারাত্মক রোগ সমূহেও লাল চোখ হতে পারে। এই সকল সমস্যায় চোখের দেখা কমে যায়, চোখে ব্যথা হয়, আলোভিতি হয় এবং রোগী বুঝতে পারেন চোখের সমস্যা অনেক গুরুতর। এরকম অবস্থা মনে হলে সত্বর একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

**প্রশ্ন : 'কিডনি দান' এর মত আমিও কি জীবিত অবস্থায় চক্ষু দান করতে পারি ?**

উত্তর : কিডনি দান এর মত জীবিত অবস্থায় চক্ষুদান করা যায় না। আমাদের দেশের আইনেও এটা নিষিদ্ধ। জীবিত অবস্থায় আপনি চক্ষুদানের অংগীকার করতে পারেন এবং মৃত্যুর পরই সেই চোখ দুইটি অন্য কারো জীবিত লোকের চোখে সংযোজন করা যেতে পারে।

চক্ষুদান বলতে শুধু কর্ণিয়া দানকেই বুঝায়। চোখের অন্যান্য অংশ যেমন লেন্স, রেটিনা ইত্যাদি অন্য কারো চোখে সংযোজন করলেও তা কার্যকরী হয় না।

কর্ণিয়ার ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র মানুষের কর্ণিয়াই অন্য মানুষের চোখে মানানসই হয়। এক্ষেত্রে সমবয়সের দাতা ও গ্রহীতা হলে কর্ণিয়া সংযোজনের ফলাফল ভালো হয়।

**প্রশ্ন : দান করা চক্ষু লাগানোর পর কি চোখে ভালো দেখা যায় ?**

উত্তর : চক্ষুদান বা কর্ণিয়া সংযোজনের পর গ্রহিতা রোগী চোখে ভালো দেখবেন কিনা তা অনেক কারণের উপর নির্ভর করে।

দাতা ব্যক্তির বয়স, তার শারীরিক বিশেষ কোন রোগ যেমন এইডস, সিফিলিস, চোখের রোগ যেমন কর্ণিয়ার ক্ষত, গ্লকোমা, চোখের ক্যানসার ইত্যাদি থাকলে এবং ঐ কর্ণিয়া সংযোজন করলে ভালো দেখার সম্ভাবনা কম।

গ্রহিতা রোগীর চোখেও কর্ণিয়ার অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশ সুস্থ্য ও ভালো থাকতে

হবে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা অন্য কোন জটিল রোগের কারণে চোখের জটিলতা থাকলে কর্ণিয়া সংযোজনের পরও ভালো দেখা যাবে না।

একমাত্র সুস্থ্য চক্ষুদাতার কর্ণিয়া, একটি সুস্থ্য চোখে অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা সংযোজন করলে চক্ষুদান করার পর ভালো দেখা সম্ভব।

**প্রশ্ন : অনেকে রাত্রে দেখতে পারেন না কেন ?**

উত্তর : রাতে কিংবা কম আলোতে দেখার জন্য আমাদের চোখের রেটিনার রড নামক এক ধরনের কোষ আছে। যাদের চোখে এই কোষগুলি তৈরী হয়নি, তৈরী হতে পারছে না বা তৈরী হবার পর কোন কারণে নষ্ট হয়েছে তারাই রাতে বা কম আলোতে ভালো দেখতে পারেন না।

আমাদের দেশে শিশুদের ক্ষেত্রে ভিটামিন এ'র অভাবে রাতকানা হওয়ার হার অনেক বেশি। চোখের রড কোষের তৈরী ও কার্যকারিতার জন্য ভিটামিন এ খুবই প্রয়োজনীয়।

বয়স ১২-১৫ বছর হলে অনেকে রাতে কম দেখা শুরু করেন। রেটিনার পিগমেন্ট কোষের ডিজেনারেশন হওয়া শুরু হলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। এ রোগের নাম- রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ রোগ এর কারণে রাতে কম দেখার প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং একসময় দিনেও কম দেখতে শুরু করেন। এই রোগে দ্রুত চোখে ছানি পড়তে পারে এবং গ্লকোমায় আক্রান্ত হতে পারে। এখনও পর্যন্ত 'রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা' রোগের চিকিৎসা সন্তোষজনক নয়। চোখের আরও কিছু সমস্যা যেমন অনেক পাওয়ার এর নিকটদৃষ্টি, রেটিনার প্রদাহ- কোরিওরেটিনাইটিস, রেটিনাল ডিটাচমেন্ট, অতি অগ্রসর গ্লকোমা রোগ ইত্যাদি নানা কারণে কম আলোতে বা রাত্রে কম দেখা যেতে পারে।

**প্রশ্ন : অনেকের মাঠে কাজ করতে গিয়ে চোখে ইনফেকশন হয়- এর কারণ কি ?**

উত্তর : আমাদের দেশে শস্য ফলন মৌসুমে- জমি চাষে বা আবাদ করার সময় চোখের ইনফেকশন অনেক বেশি দেখা যায়। মাটিতে এবং শস্যাদির পাতায় বিশেষ করে ধান গাছের পাতায় ফাংগাস জীবাণু থাকে। কোন কারণে ঐ পাতার সাথে চোখের স্পর্শ হলে ফাংগাস জীবাণু দ্রুত চোখের কর্ণিয়াতে সংক্রমণ হয় এবং কর্ণিয়ায় ক্ষত হয়, চোখের ভেতরে পূজ তৈরী হয়।

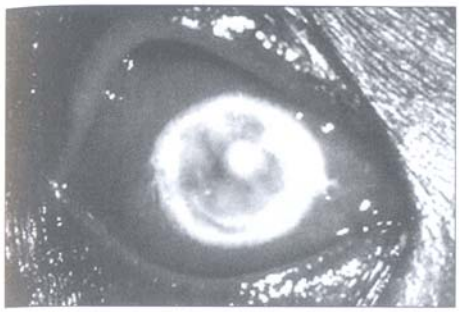

অ্যাসপারজিলাস, ক্যানডিডা, অ্যাকটিনোমাইকোসিস ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের ফাংগাস দ্বারা চোখে সংক্রমণ হতে পারে। জীবাণুর প্রকারভেদে সংক্রমণ সামান্য থেকে মারাত্মক হতে পারে। অনেকের চোখের সংক্রমণ এতই প্রকট হয় যে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় না এবং চোখ তুলে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে।

ফাংগাস ছাড়াও কৃষি কাজ করার সময় চোখে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জীবাণু দিয়েও সংক্রমণ হতে পারে।

**প্রশ্ন : নবজাতকের চোখ ওঠা- মারাত্মক কেন ?**

উত্তর : জন্ম থেকে তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত শিশুর চোখ উঠলে তা অনেক মারাত্মক হতে পারে। সাধারণ এই চোখ ওঠার নাম দেয়া হয়েছে 'অফথ্যালমিয়া নিওনেটোরাম'।

গণকক্কাস, স্টাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস, জীবাণুই নবজাতকের চোখ ওঠার কারণ। সাধারণ ডেলিভারিতে বাচ্চা ভূমিষ্ট হবার সময় চোখের এই সংক্রমণ ঘটে। নবজাতকের চোখের কর্ণিয়া ও কনজাংটিভা থাকে অত্যন্ত পাতলা। রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় 'অ্যাডেনয়েড লেয়ার' থাকে অনুপস্থিত । সেজন্য- চোখ ওঠা রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। চোখের ভেতরে ও বাইরে পুজ জমে। কর্ণিয়া ছিদ্র হয়ে জীবাণু চোখের ভেতরে প্রবেশ করে এবং কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিনের মধ্যে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

নবজাতকের চোখ ওঠা প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ বেশি জরুরী। মায়ের স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ ডেলিভারী খুবই জরুরী। নবজাতকের চোখ ওঠা রোগ নির্ণয়ের সংগে সংগে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া এবং ৫-১০ মিনিট পর পর চোখের অ্যান্টিবায়োটিক ফোঁটা ওষুধ ব্যবহার করলে চোখ ভালো হয়ে যায়।

**প্রশ্ন : ডায়াবেটিসে চোখ অন্ধ হয় কেন ?**

উত্তর : ডায়াবেটিস যদি অনেকদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে তাহলে চোখে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। সঠিক চিকিৎসা ও লেজার না করা থাকলে চোখে রক্তক্ষরণ হয়, চোখের রক্তনালী বন্ধ হয়, রেটিনায় রক্তশূন্যতার সৃষ্টি হয়। এসব কারণে রেটিনায় নতুন নতুন রক্তনালী তৈরী হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বা (P.D.R.)। পি.ডি.আর অবস্থায় লেজার চিকিৎসা না করলে চোখের রেটিনার উপরে এবং ভিট্রিয়াসের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়, রেটিনার ট্রাকশনাল ডিটাচমেন্ট তৈরী হয় এবং চোখের কোণে নতুন রক্তনালী তৈরী হয়ে নিওভাসকুলার গ্লকোমা হয়- অর্থাৎ চোখের চাপ অনেক বেড়ে যায় ও অপটিক নার্ভের ক্ষতি হয়।

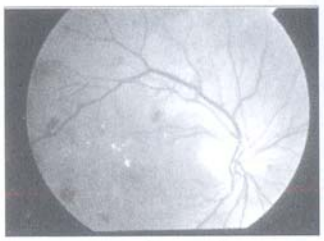

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে অপটিক নার্ভেরও রক্ত সরবরাহ কমে যায় এবং ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে। লেজার এর সাহায্যে এবং ভিট্রেকটমী অপারেশন সময়মত করতে পারলে এসকল জটিলতা তথা অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**প্রশ্ন : কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা বলতে কি বোঝায় ?**

উত্তর : চক্ষু পরীক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা তুলনামূলক একটি নতুন সংযোজন। আমাদের দেশে একযুগ আগে থেকে কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা শুরু হয়েছে। চক্ষুপরীক্ষা করার কম্পিউটারটি কি জিনিস ? কিভাবে এটা কাজ করে ? কিভাবেই বা এটা একজন মানুষের চোখের পাওয়ার বলে দেয় ? এসব প্রশ্ন অনেকেরই মনে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক সময় শুধু এই কৌতুহল নিবৃত্ত করার জন্যই অনেকে আসেন কম্পিউটারে চোখ পরীক্ষা করাতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এই যন্ত্রটির নাম হচ্ছে অটোরিফ্র্যাক্টোমিটার (Autorefractometer) অর্থাৎ যে যন্ত্রে চোখ রাখলে যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) চোখের রিফ্রাকশন বা পাওয়ার জানিয়ে দেয়। এই যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা অন্যান্য কম্পিউটারের মতো। যন্ত্রটি একটি টেবিলে বসানো থাকে।

বিভিন্ন কম্পিউটার প্রস্তুতকারী কোম্পানি এবং বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী এর আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে সব কম্পিউটারেই মূলত নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে-

(১) একটি টিভি মনিটর

(২) রোগীর থুতনী রাখার জায়গা (Chin stand)

(৩) রোগীর কপাল স্পর্শ করাবার স্থান (Forehead plate)

(৪) বিভিন্ন অপারেটিং নব (যা চিকিৎসক বা অপটিসিয়ান ব্যবহার করেন)।

যন্ত্রটির একদিকে রোগীকে বসানো হয় এবং অন্যদিকে অর্থাৎ টিভি মনিটরের সামনে চিকিৎক নিজে বসেন। রোগীর পরীক্ষা শেষ হলে টিভির পর্দার বা কোন কোন যন্ত্রে আলাদা পর্দায় তার চোখের পাওয়ার (রিডিংটি) ভেসে ওঠে এবং প্রয়োজন হলে প্রিন্টিং নবে চাপ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা ছাপিয়ে নেয়া যায়।

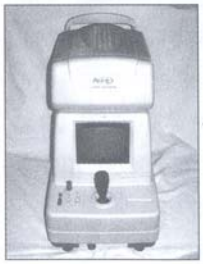

কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে :

আলোর প্রতিসরণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে এই যন্ত্র দিয়ে চোখের পাওয়ার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। রোগী এই যন্ত্রে চোখ রাখলে যন্ত্রের পেছন থেকে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করে। এই আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করার সময় কিভাবে তা প্রতিসরিত হচ্ছে তা এই যন্ত্র বিশ্লেষণ (Analysis) করে রিডিং দেয়।

রোগী এই যন্ত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী কোম্পানি এবং এর মডেল অনুযায়ী এই ছবিটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন কোন কোন কম্পিউটারে রোগী একটি তারার মতো বা গোল চাকতির মতো দেখেন। আবার কোন কোন যন্ত্রে একটি রাস্তা কাছে থেকে দূরে যাচ্ছে এরকম দেখা যায়। এই ছবিটি রোগীর কাছে মনে হবে যেন অনেক দূরে। এভাবে দূরে মনে হলে তার সামঞ্জস্যকরণ (Accommodation)

কমে যায় এবং রিডিং তুলনামূলকভাবে সঠিক হয়ে থাকে। ডান এবং বাম চোখ আলাদাভাবে পরীক্ষা করে রিডিং নেয়া হয়।

রোগীর চোখে যদি ছানি থাকে, টিউমার থাকে, রক্ত জমা থাকে বা প্রদাহের কারণে চোখে পুঁজ হয়ে থাকে তাহলে ঐ চোখের মধ্যে ঠিকমতো আলো প্রবেশ করতে পারে না বা রেটিনাতে আলো পড়ে না। এসব ক্ষেত্রে কম্পিউটার Eroor রিডিং দেয় অর্থাৎ এসব রোগীকে চশমা দিয়ে কোন কাজ হবে না। এদের অন্য চিকিৎসা প্রয়োজন।

**প্রশ্ন : সানগ্লাস বা রোদ চশমার উপকারিতা কি ?**

উত্তর : জীবনে কোনদিন রোদ-চশমা বা সানগ্লাস পরেন নি এমন লোক কম আছেন। রোদের মধ্যে চলাফেরার সময় সানগ্লাস খুবই আরামদায়ক। এছাড়া চোখের বিভিন্ন রোগ যেমন- চোখ ওঠা, প্রদাহ, ছানি অপারেশন-এর পরও চোখের আলোভীতি কমাবার জন্য সানগ্লাস ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

সানগ্লাসের সাহায্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ দৃশ্যমান আলো (Visible light) কে ফিল্টার করা হয়। যার ফলে অতিরিক্ত রোদে চোখে আরাম অনুভূত হয়।

সানগ্লাস বিভিন্ন রং-এর হতে পারে। যেমন বাদামি, ধুসর, গোলাপি, সবুজ, গাঢ়নীল ইত্যাদি। ব্যক্তিগত পছন্দের ওপরই সাধারণত: বিভিন্ন রং-এর সানগ্লাস নির্বাচন করা হয়। স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের ওপর এসব রং-এর ধোঁয়ার সাহায্যে কাচ রং করা হয় এবং সানগ্লাস তৈরি করা হয়। উন্নতমানের সানগ্লাস সব সময়ই গ্রাইন্ড ও পালিশ করা হয়। যার ফলে গ্লাসের ভেতর দিয়ে কোন বস্তুকে বা রাস্তাকে আকাবাঁকা মনে হয় না।

আমাদের দেশে ফুটপাতে বা অনেক জায়গায় কমদামী সানগ্লাস পাওয়া যায়। নিম্নমানের রঙিন প্লাস্টিক সিট থেকে গোল করে কেটে এর গ্লাস তৈরি করা হয়। এসব গ্লাস প্রয়োজনীয় গ্রাইন্ডিং ও পালিশ করা হয় না বলে রাস্তাকে বা দৃশ্যমান বস্তুকে আঁকা-বাঁকা মনে হতে পারে (Object distortion)। এসব সানগ্লাস অনেকক্ষণ ব্যবহার করলে মাথাব্যথা হতে পারে।

**প্রশ্ন : রং পরিবর্তনশীল ফটোক্রমিক গ্লাস বা চশমা কাকে বলে ?**

উত্তর : তরুণ-তরুণীদের বেশি পছন্দ ফটোক্রমিক গ্লাস। কারণ, এই গ্লাসে প্রয়োজনীয় পাওয়ার ব্যবহার করে সব দেখা যায়। আবার রোদে এর রং পরিবর্তিত হয়ে গাঢ় হয়ে যায়- যা কিছুটা সানগ্লাসের কাজ করে।

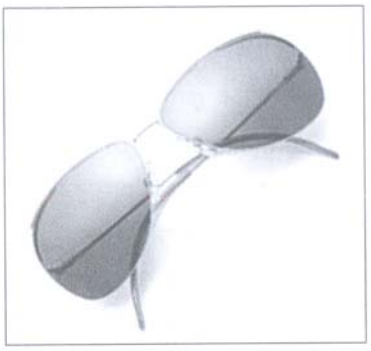

ফটোক্রমিক গ্লাসে সিলভার হ্যালাইড মাইক্রোক্রিস্টাল থাকে যা রোদে বিভাজিত হয়ে সিলভার ও হ্যালোজেন-এ রূপান্তরিত হলে কাচের রং-এর পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্লাসটি রোদ থেকে ছায়ায় আনলে আবার সিলভার হ্যালাইড হয়ে যায় এবং কাচ সাদা হয়ে যায়।

রোদে এই গ্লাস সানগ্লাসের মতো কাজ করলেও তা সানগ্লাসের মতো অত শক্তিশালী ফিল্টার নয়। সানগ্লাসে ৮৫% দৃশ্যমান আলো ফিল্টার হয় আর ফটোক্রমিক গ্লাসে মাত্র ১৫% আলো ফিল্টার হয়। তবুও রৌদ্রে ফটোক্রমিক গ্লাস বেশ আরামদায়ক। কিন্তু সানগ্লাসের বিকল্প নয়। বাণিজ্যিকভাবে এসব গ্লাসকে ফটো-গ্রে, ফটো ব্রাউন, বা ভ্যারীগ্রে ইত্যাদি বলা হয়।

আমেরিকার কর্নিং গ্লাস কোম্পানি এক ধরনের ফটোক্রমিক লেন্স তৈরি করেছে যা রোদে গেলে পূর্ণ সানগ্লাসের মতো হয়ে যায় কিন্তু ছায়াতে সামান্য রঙিন মনে হয়। বাণিজ্যিকভাবে এসব গ্লাসকে ফটোসান গ্রে, ফটোসান ব্রাউন ইত্যাদি নামকরণ করা হয়।

**প্রশ্ন : আয়না চশমা কাকে বলে ?**

উত্তর : এটি একটি বিশেষ ধরনের চশমা যা দিয়ে পরিহিত ব্যক্তি সব পরিস্কার দেখতে পারবেন কিন্তু বাইরে থেকে তাঁর চোখ দেখা যাবে না। সাদা বা রঙিন লেন্সে এই আয়নার কোটিং দেয়া যায়।

ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী চেহারার বিকৃতি ঘটলে, চোখ তুলে ফেললে বা কোন

কারণে রোগী তার চোখ ও ওপরের মুখ দেখাতে না চাইলে এই ধরনের আয়না চশমা খুবই উপযোগী।

রোগীর ইচ্ছানুযায়ী সানগ্লাসের মতো তার লেন্সে যে কোন রং করিয়ে নিতে পারেন।

**প্রশ্ন : চশমা পড়লে চামড়ার এলার্জি হয় কেন ?**

উত্তর : অনেক লোকেরই চশমার ফ্রেম ব্যবহারের ফলে চামড়ার এলার্জি (contact dermatitis) হতে দেখা যায়।

ফ্রেম যে সকল স্থানে চামড়ার সংস্পর্শে আসে যেমন নাকের ওপর ও দুই প্রান্ত, চিবুকে ও কানের পেছনে এই প্রদাহ হতে পারে। যদিও সাধারণত: একটা ধারণা আছে চশমার ফ্রেমে এলার্জি হয় কিন্তু এটা স্বাভাবিক চর্মের প্রদাহও হতে পারে। ফ্রেমের দিনরাত ঘর্ষণের ফলে বা পুরাতন ফ্রেমের টেম্পলের পেছন দিকে অমসৃণ (rough) বা কোন কোন স্থানে ময়লা লেগে থেকেও এই ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

সাধারণত জাইলোনাইট দিয়ে তৈরি প্লাস্টিকের ফ্রেম ও নিকেলের ফ্রেম ব্যবহার করলে বেশি এলার্জিক প্রদাহ হতে পারে। যদিও নিকেলের ফ্রেম ২/১ দিন ব্যবহার করলেই এলার্জি হয় না। বার বার ব্যবহার করার ফলে নিকেলের সঙ্গে চামড়ার কোষের প্রতিক্রিয়া হয়ে এই প্রদাহ হতে পারে।

**প্রশ্ন : কিভাবে চশমা ও গ্লাসের যত্ন নিতে হবে ?**

উত্তর : সঠিকভাবে চশমা ও এর কাচের যত্ন না করলে অল্পদিনে ফ্রেম নষ্ট হয়ে যায়, কাচ ভেঙ্গে যেতে পারে বা কাচে দাগ হয়ে তার ভেতর দিয়ে পরিস্কার না-ও দেখা যেতে পারে। চশমা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিচের নিয়মগুলি অনুসরণ করা উচিত।

(১) চশমার ফ্রেম পরিস্কার রাখতে হবে। অল্প গরম পানিতে মাঝে মধ্যে ধুয়ে এর ময়লা আঠা পরিস্কার করা যায়।

(২) চশমার কাচও একইভাবে পরিস্কার করা যায়। অনেক চশমার দোকানে পরিস্কার করার সল্যুশন পাওয়া যায়।

(৩) ব্যবহার না করার সময় চশমা এর বাক্সে বা খাপে ঢুকিয়ে রাখা উচিত।

অথবা ফ্রেমের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু কাচের দিক নিচে রাখা ঠিক নয়।

(৪) চশমা খোলবার সময়, সবসময়ই দুই হাত দিয়ে ফ্রেমের জয়েন্টের কাছে ধরে খুলতে হবে। এক হাতে খুলতে গেলে ফ্রেম বেঁকে যেতে পারে, এমনকি ভেঙ্গে যেতে পারে।

(৫) শীতকালে অনেকসময় কুয়াশাতে চশমার কাচ ঘোলা হয়ে যায়। বাজারে ডিফগিং (defogging) সল্যুশন পাওয়া যায় যা দিয়ে কাচ পরিস্কার করলে আর ঘোলা হয় না।

**প্রশ্ন : ডায়াবেটিসে চোখের ভেতর লেজার চিকিৎসার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি ?**

উত্তর : লেজার রশ্মির চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে দৃষ্টিশক্তির বর্তমান মাত্রাকে ধরে রাখা। ডায়াবেটিসের জটিলতা থেকে চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেটা প্রতিহত করার জন্য লেজার চিকিৎসা দেয়া হয়। কোন কোন রোগীর দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়না তা নয় কিন্তু উন্নতির আশা না করাই ভাল। ডায়বেটিসের জটিলতায় লেজার করা হলে নিম্নলিখিত যে কোন জটিলতা হতে পারে। যেমন :

১। রাতে অপেক্ষাকৃত কম দেখা। এর তীব্রতা নির্ভর করে চোখে রেটিনোপ্যাথি কি পর্যায়ে এবং কত সংখ্যা লেজার বার্ণ দেয়া হয়েছে তার উপর।

২। পুরো রেটিনাতে লেজার দেয়া হলে দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। অবশ্য এতে রোগীর চলাফেরার তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

৩। লেজার করার পর চোখের ম্যাকুলাতে পানি জমে ক্ষণস্থায়ীভাবে দৃষ্টির প্রখরতা সামান্য কমে যেতে পারে। তবে ১/২ সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় পূর্বের দৃষ্টি ফিরে পাওয়া যায়।

৪। পুরো রেটিনাতে লেজার দেবার ফলে চোখের সামঞ্জস্যকরণ বা একোমোডেশন কমে যায়, এর ফলে পূর্বের চশমা দিয়ে নিকটের বস্তু দেখতে ঝাপসা লাগতে পারে। চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী নিকটে দেখার পাওয়ার কিছুটা বাড়িয়ে নিলে আবার পরিস্কার দেখা সম্ভব।

৫। লেজার চিকিৎসার পর নতুন রক্তনালি প্রত্যাবৃত্তি করে। এই সময় চোখের রেটিনাতে সামান্য রক্তক্ষরণ হতে পারে। অত্যন্ত শেষ পর্যায়ের রেটিনোপ্যাথিতে ফাইব্রো-ভাসকুলার টিস্যু তৈরি হলে সাধারণত এমনটি ঘটে।

৬। অসাবধানতাবশত বা রোগী হঠাৎ করে চোখ নাড়িয়ে ফেললে ম্যাকুলাতে বার্ণ হয়ে যেতে পারে, তাতে দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে।

৭। বেশি বার এবং বেশি করে লেজার দেবার প্রয়োজন হলে চোখের লেন্সের মধ্যে লেজার রশ্মির শোষণ হতে পারে। এতে তুলনামূলকভাবে দ্রুত ছানি পড়তে পারে।

**প্রশ্ন : ডায়াবেটিসে চোখের পাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন হয় কেন ?**

উত্তর : ডায়াবেটিসের সাথে চোখের পাওয়ারের একটা সরাসরি যোগ রয়েছে। রক্তে শর্করা বৃদ্ধি বা কমার ফলে চোখের পাওয়ার ও সাময়িকভাবে বাড়তে পারে বা কমতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে চোখের অ্যাকুয়াস হিউমারেও শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এর ফলে চোখের লেন্সে আস্রাবন বা অসমোটিক পরিবর্তন হয়। এতে লেন্সের মধ্যে পানি+চিনি বেশি করে প্রবেশ করে লেন্সটি পুরু হয়ে যায়, এর ফলে লেন্সের পাওয়ার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় মায়োপিক শিফট্। এই অবস্থায় অর্থাৎ বেশি মাত্রার অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে রোগী হঠাৎ করে দূরের বস্তু ঝাপসা দেখতে শুরু করেন। অপর দিকে যারা আগে নিকটে পড়ালেখা করতে পারতেন না, তারা হঠাৎ করেই নিকটে দেখতে পারেন এবং কেউ কেউ ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলে থাকেন, তার চোখের পাওয়ারের উন্নতি হয়েছে। যে সকল ডায়াবেটিস রোগীর চশমা পরার প্রয়োজন হয় এবং প্রায়ই রক্তের শর্করা বেড়ে বা কমে যায় তারা প্রায়ই চক্ষু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

অন্য দিকে যে সব রোগী ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনসুলিন ব্যবহার করেন, তাদের বেলায় মাঝে মাঝে উল্টো ঘটনা ঘটে । তারা যদি কোন কারণে বেশি ইনসুলিন নিয়ে ফেলেন বা প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রম করে ফেলেন তখন হঠাৎ করে পূর্বের চশমা দিয়ে আর নিকটের কাজ, যেমন লেখাপড়া করতে অসুবিধা হয় । এখানে অতিরিক্ত ইনসুলিন ইনজেকশন নেবার ফলে রক্তের শর্করা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে যায় এবং অ্যাকুয়াস হিউমারেও চিনির পরিমান কমে যায়। এ অবস্থায় অসমোটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে লেন্স থেকে পানি+চিনি বেরিয়ে আসে, ফলে লেন্সের পাওয়ার পূর্বের তুলনায় কমে যায়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে চোখের পাওয়ার সাময়িকভাবে বাড়তে বা কমতে পারে বিধায় চক্ষু চিকিৎসকগণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করার পরই চোখের পাওয়ার পরীক্ষার উপদেশ দিয়ে থাকেন।

একই কারণে ডায়াবেটিক রোগীদের শরীরে কোন প্রদাহ থাকলে বা মানসিক চাপ থাকলেও চশমার পাওয়ার দেয়া ঠিক নয়, তাতে প্রদত্ত পাওয়ার শীঘ্রই পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে।

**প্রশ্ন : পানি, চা বা কফি খেলে কি চোখের গ্লকোমা হয় ?**

উত্তর : সাধারণ মাত্রায় পানি, চা বা কফি খেলে গ্লকোমা হয় না। কিন্তু যদি কারও বংশগত গ্লকোমার প্রবণতা থেকে থাকে তাহলে অতি মাত্রায় পানি, চা বা কফি সেবন তার জন্য ক্ষতিকর। কয়েক মিনিটের মধ্যে ১ লিটার পানি পান করলে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে। যাদের চোখে গ্লকোমা হবার সম্ভাবনা নেই তাদের

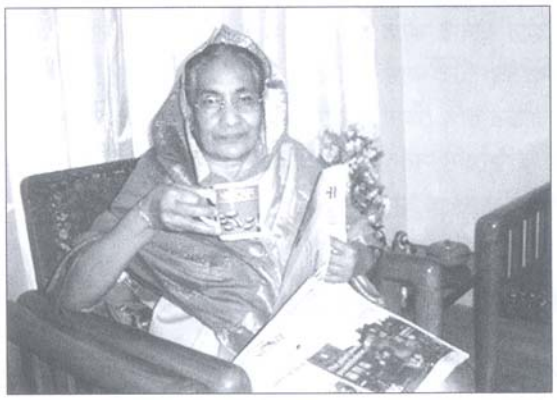

২ থেকে ৭ মিঃ মিঃ মারকারি পর্যন্ত এই চাপ বাড়ে। কিন্তু যাদের গ্লকোমা হবার সম্ভাবনা আছে (Glaucoma suspect) তাদের ক্ষেত্রে এই চাপ ৮/১০ মিঃ মিঃ মারকারি বা এরও বেশি বেড়ে যেতে পারে ও অপটিক নার্ভের ক্ষতি করতে পারে। এভাবে এক লিটার পানি পান করিয়ে সম্ভাব্য রোগীদের সত্যিকার অর্থে গ্লকোমা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষাটির নাম ওয়াটার ড্রিংকিং টেস্ট (Water Drinking Test)

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যাদের বংশতগত কারণে গ্লকোমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারা একসঙ্গে বেশিমাত্রায় পানি খেলে, যেমন- অনেকে হাইড্রেশন-থেরাপি হিসাবে সকালে ৩/৪ গ্লাস পানি একই সঙ্গে খেয়ে ফেলেন অথবা কিডনি রোগের জন্য অনেকে একসঙ্গে প্রচুর পানি খান তাদের চোখের চাপ

বেড়ে গ্লকোমা রোগ হতে পারে। তাই এদের মাঝে মধ্যে গ্লকোমা রোগের জন্য চক্ষু পরীক্ষা করানো উচিত।

**প্রশ্ন : উচ্চ রক্তচাপের সাথে কি চোখের উচ্চ চাপ বা গ্লকোমার কোন সম্পর্ক আছে ?**

উত্তর : রক্তের উচ্চচাপের সঙ্গে চোখের উচ্চচাপ বা গ্লকোমার একটি সম্পর্ক আছে। দেখা যায় রক্তের চাপ প্রতি ১০ মিঃমিঃ মারকারি বাড়ার দরুন চোখের চাপ ১ মিঃ মিঃ মারকারি বেড়ে যায়। যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় ২/১ দিনের মধ্যেই চোখের এই বাড়তি চাপ ঠিক হয়ে যায়। এই দিক দিয়ে রক্তের চাপ খুব বেশি না বাড়লে চোখে তেমন ক্ষতি হয় না। বরং ৬০/৭০ বছর বয়সে রক্তের ধমনি ও শিরা শক্ত হয়ে যাবার ফলে চোখে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ কম হয় এবং অপটিক নার্ভ ফাইবারের ক্ষতি হতে পারে। এই দিক দিয়ে বয়স্ক রোগীদের রক্তের চাপ কোন কারণে অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে অপটিক নার্ভের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় এবং এর ফাইবারের ক্ষতিসাধন করে ও দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়।

**প্রশ্ন : দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে- চোখে ছানি না কি গ্লকোমা হয়েছে ?**

উত্তর : চোখের ছানি ও গ্লকোমা উভয় রোগেই চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যার ফলে গ্লকোমার কারণে দৃষ্টি কমতে থাকলেও অনেকে চোখের ছানি ভেবে ভুল করে থাকেন। ছানি অনেকের কাছেই পরিচিত একটি চোখের অসুখ। এটা পাকতে সময় লাগে এবং এর অপারেশন করে চিকিৎসা করা হয়। অনেকে এক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে গ্লকোমাকে ছানি মনে করে তা পাকার জন্য অপেক্ষা করেন এবং যখন রোগী প্রায় অন্ধ হয়ে যান তখন ছানি পেকে গেছে ভেবে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য আসেন। এই অবস্থায় সত্যি যদি ছানি রোগ হয় তাহলে তার সঠিক চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু রোগী যদি গ্লকোমাতে ভুগে অন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার আর চিকিৎসা নেই। অথচ এই রোগী যদি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের কাছে আসতেন তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার পর চিকিৎসা করা যেত ও অন্ধত্ব এড়ানো সম্ভব হতো।

**প্রশ্ন : চোখের প্রেসার বাড়লেই কি গ্লকোমা হয় ?**

উত্তর : অনেক মানুষের চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি থাকতে পারে কিন্তু এদের পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় অপটিক ডিস্কের কাপ-ডিস্ক অনুপাত স্বাভাবিক এবং দৃষ্টির পরিসীমাও স্বাভাবিক তাহলে তাদেরকে বলা হয় অকুলার হাইপারটেনশন। এসব রোগীর কেউ কেউ ভবিষ্যতে অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা রোগীতে রূপান্তরিত হতে পারে বিধায় এদেরকে 'গ্লকোমা সাসপেক্ট' (Glaucoma Suspect) বলা হয়। এসব রোগীকে ওয়াটার ড্রিংকিং টেস্ট (Water Drinking Test) কিংবা দৃষ্টির পরিসীমা পরীক্ষা করে যদি পজিটিভ পাওয়া না যায় তাহলে বছরে একবার পরীক্ষা করলেই চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঐ একটু বেশি চোখের চাপ হয়তো ঐ চোখের জন্য স্বাভাবিক এবং তা অপটিক নার্ভের জন্য ক্ষতিকর নয়।

অকুলার হাইপারটেনশনের রোগীদেরকে সাধারণত কোন চিকিৎসা দেবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি ফলোআপ পরীক্ষাতে অপটিক নার্ভ বা দৃষ্টির পরিসীমার কোন পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার ন্যায় চিকিৎসা করাতে হবে।

**প্রশ্ন : চোখের প্রেসার স্বাভাবিক থেকেও কি গ্লকোমা হতে পারে ?**

উত্তর : হ্যাঁ- চোখের প্রেসার স্বাভাবিক ১০-২০ মি.মি. মারকারী থেকেও এক ধরনের গ্লকোমা হতে পারে। যাকে বলা হয় লো টেনশন গ্লকোমা বা নরমাল টেনশন গ্লকোমা।

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার মতো এটি এক ধরনের গ্লকোমা যেখানে অপটিক নার্ভ ও দৃষ্টির পরিসীমায় প্রমাণিত পরিবর্তন দেখা যায় কিন্তু চোখের চাপ স্বাভাবিক অর্থাৎ ২১ মিঃ মিঃ মারকারির কম থাকে। এজন্য এ ধরনের গ্লকোমাকে নরমাল টেনশন গ্লকোমাও বলা হয়ে থাকে। চোখের চাপ কম থাকলেও কেন গ্লকোমা হয় এ নিয়ে অনেক মতভেদ ও তত্ত্ব (theory) আছে। অনেকের মতে, কিছু মানুষের স্বাভাবিক মাত্রার চোখের চাপও ঐ বিশেষ চোখটির জন্য বেশি এবং অপটিক নার্ভের পরিবর্তন করতে সক্ষম।

অনেকে মনে করেন, ঐ রোগীর জীবনে জন্মের সময় বা পরে কোন এক সময়ে রক্তের চাপ অত্যন্ত কমে যাওয়ায় চোখের ভেতরে ও অপটিক নার্ভে রক্ত সরবরাহ

কমে গিয়ে অপটিক নার্ভের ক্ষতিসাধন করেছিল। ফলে তার চোখের কাপ-ডিস্ক অনুপাত বেড়ে যায় এবং দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। পরবর্তীকালে রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়ে যাবার ফলে বিনা ওষুধেই চোখের চাপ স্বাভাবিক বা কম থাকে। অন্য এক তত্ত্ব অনুযায়ী রোগীর চোখের চাপ যখন মাপা হয় তখন হয়তো স্বাভাবিক থাকে কিন্তু দিনে বা রাতে কোন এক সময়ে চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় এবং অপটিক নার্ভের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে লো টেনশন গ্লকোমা রোগীদের প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর অন্তর মোট ২৪ ঘন্টা চোখের চাপ মাপা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার নাম ফেজিং (Phasing)। এই পরীক্ষায় যদি দেখা যায়, কোন বিশেষ সময়ে রোগীর চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে এতে রোগনির্ণয়সহ চিকিৎসারও সুবিধে হয়। দিন-রাতের ঠিক যে সময়টিতে ঐ চাপ বেড়ে যায় তার এক ঘন্টা আগে চোখের চাপ কমাবার ড্রপ দিলে চাপ স্বাভাবিক থাকবে এবং চোখের পুনরায় ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যাবে। রোগনির্ণয় হয়ে গেলে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার অনুরূপ অপারেশন করেও এই রোগটির চিকিৎসা করা যেতে পারে। এ রোগে সাধারণত: চোখের চাপ ১২ মি:মি: মারকারি বা তার চেয়ে কম রাখার চেষ্টা করা হয়।

**প্রশ্ন : অনেকক্ষণ পড়াশোনা, সেলাই করা বা টিভি দেখলে কি গ্লকোমা হয় ?**

উত্তর : অল্প আলোতে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনা, সেলাই করলে বা টেলিভিশন দেখলে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার সূত্রপাত হতে পারে।

যাদের চোখে স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার তাদেরই এরকমটি হতে পারে। সব মানুষের এই অসুবিধা হয় না। সুতরাং একমাত্র যারা অন্ধকার বা অল্প আলোতে কাজ করার সময় চোখে বা মাথায় ব্যথা অনুভব করেন তারা চক্ষু চিকিৎসককে দেখিয়ে গ্লকোমা আছে কি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।

**প্রশ্ন : গ্লকোমা প্রতিরোধ করার উপায় কি ?**

উত্তর : গ্লকোমা প্রতিরোধের প্রধান শর্ত হলো এ বিষয়ে ব্যাপক জন-সচেতনতা সৃষ্টি এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহ সকল সাধারণ চিকিৎসকের এ রোগ নির্ণয়ে অংশগ্রহণ। আর এ দুটো বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরি করার জন্য সমাজের শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিবর্গ এবং চিকিৎসক সমাজকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

ব্যাপক জন-সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল প্রচার মাধ্যমে (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন) সাধারণ মানুষের জন্য সহজ সাবলীল ভাষায় এবং অবশ্যই মাতৃভাষায় এ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রচার করতে হবে এবং এ কাজে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসতে হবে।

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রামে-গঞ্জে চক্ষু শিবির করে যখন চোখের ছানি অপারেশন করেন তখন সম্ভাব্য রোগীদের (পঁয়ত্রিশোর্ধ নারী পুরুষ) গ্লকোমা স্ক্রিনিং টেস্ট করা যেতে পারে। এতে সহজে সরাসরি রোগনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনগণের মধ্যে এ রোগটি সম্পর্কে সচেতনতাও সৃষ্টি হবে।

সাধারণ চিকিৎসকদের (জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স) জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা যায়। ফলে এ রোগনির্ণয়ের বিভিন্ন আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে এ রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের দেশে চক্ষু বিশেষজ্ঞের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম তাই সাধারণ চিকিৎসকদের এ বিষয়ে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

গ্লকোমা রোগীও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি তার রোগ ও চিকিৎসার অভিজ্ঞতা তার আশেপাশের লোকজনকে জানালে তারা সহজেই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা করিয়ে চোখকে অন্ধত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন। এছাড়া পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর বছরে একবার চোখের চাপ নির্ণয়সহ সম্পূর্ণ চক্ষু পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। এটা সবাই উপলব্ধি করলে গ্লকোমা রোগটি প্রতিরোধ সহজতর হবে।

**প্রশ্ন : চক্ষুদান বলতে কি বোঝায় ?**

উত্তর : চক্ষুদান বলতে চোখের কর্ণিয়া দান এবং কর্ণিয়া সংযোজনকে বোঝানো হয়ে থাকে। যদিও চক্ষুদানের জন্য মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ চোখটিকেই তুলে নেয়া হয় এবং চোখের সামনের স্বচ্ছ অংশ বা কর্ণিয়াকে আলাদা করে- জীবিত ব্যক্তির অস্বচ্ছ কর্ণিয়া বাদ দিয়ে সেখানে স্থাপন করা হয় বা সংযোজন করা হয়।

মৃত্যুর সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত ব্যক্তির চোখটি স্বযত্নে তোলা হয় কিন্তু চোখ তুলে বেশিক্ষণ সংরক্ষণ করা যায় না। ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই চোখ থেকে কর্ণিয়া আলাদা করে জীবিত ব্যক্তির চোখে সংযোজন করা হয়। তবে অনেক মূল্যবান মিডিয়াতে কর্ণিয়া অনেকদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায় এবং দেশে বিদেশে পাঠানো যায়।

খুব ছোট শিশুদের এবং ৭০ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিদের কর্ণিয়া চক্ষুদানের জন্য উপযোগী নয়। এছাড়া যাদের এইডস, হেপাটাইটিস, সিফিলিস, ক্যান্সার রোগ আছে তাদের চোখও চক্ষু দানের জন্য উপযোগী নয়।

**প্রশ্ন : দিন কানা কাকে বলে ?**

উত্তর : যে সব ব্যক্তি দিনে কম দেখেন, কিন্তু তুলনামূলক রাত্রে ভালো দেখেন- তাদেরকে দিন কানা বলা হয়ে থাকে।

যাদের চোখের লেন্সের কেন্দ্রে ঘোলা হয়েছে বা ছানি পড়েছে, (central cataract) কর্ণিয়ার কেন্দ্রে কোন কারণে ঘোলা হয়েছে, চোখের রেটিনার কেন্দ্রে বা ম্যাকুলাতে ডিজেনারেশন, ছিদ্র বা পানি জমেছে, সেসব ব্যক্তি রাত্রে চোখের মণি (পিউপিল) বড় হবার কারণে তুলনামূলক ভালো দেখতে পাবেন। এই সকল রোগী দিনের বেলা বা উজ্জ্বল আলোতে মণি ছোট হয়ে যাবার কারণে আলো চোখে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হয় এবং ভালো দেখতে পারেন না।

**প্রশ্ন : সাধারণ চোখ ওঠা রোগে কি চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত ?**

উত্তর : সাধারণ চোখ ওঠা বলতে ঋতুনির্ভর ভাইরাস জণিত চোখ ওঠাকেই বোঝায়। এই জাতীয় চোখ ওঠা নিজে নিজে ৭/৮ দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। চোখের অস্বস্তি, কাটা কাটা লাগা, চোখ লাল হওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। তবে চোখে দেখার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় না। এ রকম চোখ ওঠা হলে-

একটি এন্টিবায়োটিক ফোটা ওষুধ দিনে ৬/৭ বার চোখে দিলে চোখের আরাম অনুভূত হবে।

সাধারণ 'চোখ ওঠা' থেকে অনেকের কর্ণিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্ষত হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর আলো ভীতি বেশি হবে, বেশি বেশি চোখ দিয়ে পানি পড়বে এবং দেখা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমে যাবে। এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

**প্রশ্ন : ৬/৬ চোখের দৃষ্টি বলতে কি বোঝায় ?**

উত্তর : চোখের দৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি চোখের শক্তি বা পাওয়ার যা দ্বারা আমরা বিভিন্ন বস্তুকে আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারি বা বুঝতে পারি।

চোখের দৃষ্টি মাপার জন্য সাধারণত: স্নেলেন্স চার্ট ব্যবহার করা হয়। এই চার্টে

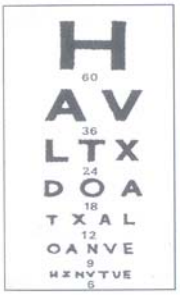

ইংরেজি, বাংলা, অন্য ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন চিহ্ন থাকে। সাধারণত: ৭টি লাইনে এই চিহ্নগুলি একটি নিয়মের মধ্যে বড় থেকে ছোট আকারে সাজানো থাকে এবং লাইনগুলির নিচে ৬০, ৩৬, ২৪, ১৮, ১২, ৯, ৬- এভাবে লেখা থাকে।

চার্টটি রোগী থেকে ২০ ফুট বা ৬ মিটার দূরে রাখা থাকে। কোন ব্যক্তি ৬ মিটার দূর থেকে সবচেয়ে নিচের ও ছোট অক্ষরের লাইনটি দেখতে পারলে বা পড়তে পারলে তার দৃষ্টি শক্তিকে বলা হবে ৬/৬। কেউ যদি শেষ লাইন দেখতে না পারেন কিন্তু নিচ থেকে ২য় লাইন দেখতে পারেন তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি হবে ৬/৯, এভাবে শুধুমাত্র সবচেয়ে উপরের লাইন বা অক্ষর দেখতে পারলে তার দৃষ্টিশক্তি হবে ৬/৬০।

প্রশ্ন : ল্যাসিক সার্জারী কাকে বলে ?

উত্তর : যাদের চোখের পাওয়ার আছে- কিন্তু চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স পরতে চান না- তাদের জন্য আধুনিক একটি চিকিৎসা ব্যবস্থার নাম- ল্যাসিক সার্জারী। ল্যাসিক ইংরেজী Laser Assisted In-Situ Keratomileusis এর সংক্ষিপ্ত নাম LASIK. এক্সাইমার (Excimer) লেজার রশ্মির সাহায্যে চোখের কর্ণিয়ার আকৃতির বা গঠনের পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ চোখের পাওয়ারের পরিবর্তন করা হয়। ল্যাসিক পদ্ধতির অপারেশন এর প্রকারভেদের মাধ্যমে মাইনাস বা প্লাস পাওয়ারকে পরিবর্তন করে বিনা পাওয়ার বা জিরো পাওয়ার করা হয়।

কাদের চোখে ল্যাসিক করা যায় ?

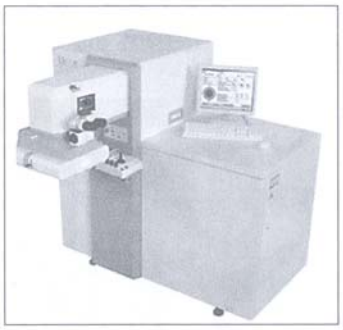

১) নিকট দৃষ্টি বা মায়োপিয়া (-২.০০ থেকে - ২০.০০ ডায়াপ্টার পর্যন্ত)

২) দূরদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রপিয়া (+২.০০ থেকে +৮.০০ ডায়াপ্টার পর্যন্ত)

৩) অ্যাসটিগম্যাটিজম (১.০০ ডায়াপ্টার থেকে ৭ ডায়াপ্টার পর্যন্ত)

৪) সাধারণত: ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সের পরে।

ল্যাসিক অপারেশন পদ্ধতি

- চোখের ড্রপ বা ফোঁটা ওষুধ দিয়ে কর্ণিয়াকে অবশ করা হয় এবং এক্সাইমার লেজার রশ্মির সাহায্যে এর আকৃতির পরিবর্তন করা হয়।
- রোগী লেজার দেয়ার সময় অবশ করা হয় বলে কোন ব্যাথা পান না।
- এই অপারেশন একটি মাইক্রোসার্জারী। সুতরাং রোগীকে টেবিলে শোয়ানো হয় এবং চোখের উপরে অপারেশন মাইক্রোসকোপ এনে- ফোকাস করা হয়।
- মাইক্রোকেরাটোম এর সাহায্যে, খুব পাতলা- কর্ণিয়ার একটি লেয়ার তৈরী

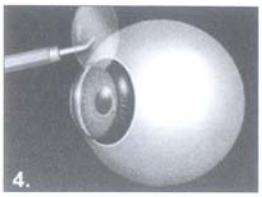

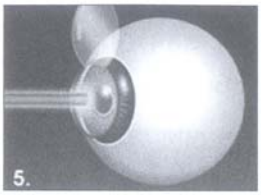


করে তা উল্টিয়ে রাখা হয় এবং চোখের কর্ণিয়ার উপরে ১৫-৬০ সেকেন্ড লেজার দেয়া হয়। কতটুকু লেজার প্রয়োজন হবে তা ঐ চোখের পাওয়ার পরিবর্তন এর উপর নির্ভর করে- কম্পিউটারের সাহায্যে হিসাব করেই দেয়া হয়। এরপর কর্ণিয়ার ঐ পাতলা লেয়ারটি পূর্বের স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়।

- লেজার দেবার পর- রোগী ১৫ থেকে ৩০ মিনিট হাসপাতালে অবস্থান করে বাড়ী চলে যেতে পারেন।

ল্যাসিক সার্জারী- যথেষ্ট নিরাপদ একটি ব্যবস্থা। এই অপারেশন এর ফলাফল শতকরা ৯৯ ভাগই সফল। যেহেতু এটি একটি অপারেশন, সেজন্যে কার কারও ক্ষেত্রে সামান্য অপারেশন জটিলতা হতে পারে। অভিজ্ঞ ল্যাসিক সার্জন এর হাতে এ জটিলতাও খুব কম। অনেক রোগী- অপারেশন এর সময় ও পরে ২/৩ ঘন্টা চোখে সামান্য ব্যথা ও চাপ অনুভব করেন। সাধারণত: ১ দিন পরই এ সকল উপসর্গ ভালো হয়ে যায়।

চোখে অন্ধত্ব হয়ে যাবার মত জটিলতা এই সার্জারীতে হয় না বললেই চলে।

ল্যাসিক এর পরপরই রোগী বেশ ভাল দেখতে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ ভালো হতে অনেকের প্রায় এক মাস সময় লাগতে পারে।

অপারেশন-এর পর ল্যাসিক বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকবার রোগীকে পুনঃ পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনে ওষুধ এবং সামান্য পাওয়ারের চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স দিতে পারেন।

কাদের চোখে ল্যাসিক করা উচিত নয়

- সাধারণত: ১৮ বছর বয়সের পূর্বে। কারণ এই বয়সের পূর্বে চোখের পাওয়ার এর দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে।
- যাদের চোখের পাওয়ার প্রতি বছরই অতিমাত্রায় পরিবর্তন হচ্ছে বা স্থিতিশীল হচ্ছে না।

- গর্ভবতী মহিলা (লেজার রশ্মি দ্বারা ভ্রূণের ক্ষতি এড়ানোর জন্য)
- চোখের কোন অসুখ যেমন গ্লকোমা, ছানি, ভাইরাসজনিত চোখের রোগ থাকলে- ল্যাসিক করা উচিত নয়।
- শারীরিক কিছু রোগ যেমন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস, এস.এল.ই ইত্যাদি থাকলে ল্যাসিক করা উচিত নয়।

**প্রশ্ন : কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম কাকে বলে ?**

উত্তর : কম্পিউটার বা কম্পিউটারের মত যন্ত্রপাতিতে নিয়মিত ও অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে চোখের নানা সমস্যা ও উপসর্গ দেখা দিতে পারে- এই অবস্থাকে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে- আমেরিকার ১৪৩ মিলিয়ন লোক প্রতিদিন কম্পিউটারে কাজ করে থাকেন এবং তাঁদের ৮৮% লোকেরই সামান্য থেকে বেশি, নানা মাত্রার চোখের উপসর্গ রয়েছে। সুতরাং কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম- সারা বিশ্বে একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যায় পরিগণিত হয়েছে।

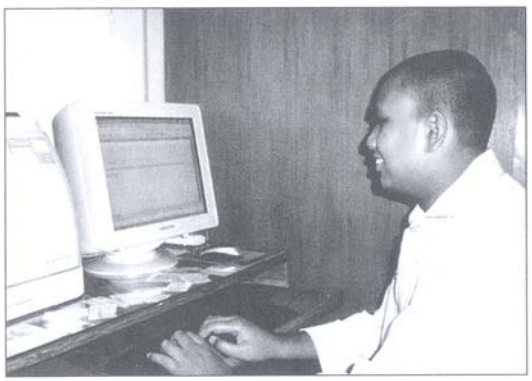

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম-এর উপসর্গসমূহ ঃ

১) মাথা ব্যাথা, চোখে ব্যাথা

২) চোখ জ্বালাপোড়া করা

৩) চোখের ক্লান্তি বোধ করা

৪) ঝাপসা দেখা বা মাঝে মাঝে একটি বস্তুকে দু'টি দেখা

৫) ঘাড়ে ও কাঁধে ব্যাথা

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম-এর কারণ ঃ

কম্পিউারের অক্ষরগুলো ছাপার অক্ষরের মত নয়। ছাপার অক্ষরগুলোর মধ্যভাগ এবং পার্শ্বের ঘনত্ব একই রকম- এগুলো দেখার জন্য সহজেই চোখের ফোকাস করা যায়, অন্যদিকে কম্পিউটারের অক্ষরগুলোর মধ্যভাগ ভালো দেখা যায় কিন্তু পার্শ্বভাগের ঘনত্ব কম হওয়ায় পরিস্কার ফোকাসে আসে না। কম্পিউটারের অক্ষরগুলোর এই ফোকাসের অসমতার জন্য চোখের নিকটে দেখার যে প্রক্রিয়া বা একামোডেশন ঠিকমত কাজ করতে পারে না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ কম্পিউটারে কাজ করলে চোখের নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

কম্পিউটারের চশমা ঃ

সাধারণ লেখাপড়ার সময় ১৪´´- ১৬´´ দূরে পড়ার জন্য যে পাওয়ারের চশমা লাগে কম্পিউটারে কাজ করার সময় ১৮´´- ২৮´´ দূরে মনিটর রেখে সে পাওয়ার দিয়ে ভালো দেখা যায় না। চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ কম্পিউটারে কাজ করার জন্য বিশেষ পাওয়ারের চশমা দিয়ে থাকেন- যার নাম- কম্পিউটার চশমা বা (Computer Eye Glass) পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের (Unifocal) বা শুধুমাত্র একটি পাওয়ারের চশমা দিলেই চলে কিন্তু পঁয়ত্রিশোর্ধ ব্যক্তিদের জন্য কোন কোন সময় ঐ ইউনিফোকাল চশমা দিয়ে তুলনামূলক নিকটে কপি পড়তে অসুবিধা হতে পারে- তাদের জন্য মাল্টি ফোকাল চশমা দিলে কপি পড়া এবং কম্পিউটার মনিটরে কাজ করার সুবিধা হয়।

কম্পিউটারে ভিশন সিনড্রম থেকে মুক্তি পাবার ৯টি উপায় ঃ

১) চক্ষু পরীক্ষা : কম্পিউটার ব্যবহারের পূর্বে চক্ষু পরীক্ষা করে, চোখের কোন পাওয়ার থাকলে অবশ্যই চশমা ব্যবহার করতে হবে। পয়ত্রিশোর্ধ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কম্পিউটার আই গ্লাস ব্যবহার করতে হবে।

২) সঠিক আলোর ব্যবহার : রুমের ভিতরে বা বাইরে থেকে আসা অতিরিক্ত আলো- চোখে ব্যাথার কারণ হতে পারে। বাইরে থেকে আলো এসে চোখে না লাগে বা কম্পিউটার স্ক্রীনে না পড়ে সে জন্যে পর্দা, ব্লাইন্ড ইত্যাদি

ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের আলো- টিউব লাইট বা ফ্লোরেসেন্ট বাল্বের আলো হলে এবং স্বাভাবিক অফিসের আলোর চাইতে কিছুটা কম হলে চোখের জন্য আরামদায়ক।

৩) গ্লেয়ার কমানো : কম্পিউটার মনিটরের অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ক্রীন ব্যবহার করে এবং চশমায় অ্যান্টি রিফ্লেকটিভ প্লাস্টিক এর কাঁচ ব্যবহার করলে গ্লেয়ার কমানো যায়।

৪) কম্পিউটার মনিটরের 'ব্রাইটনেস' বাড়ানো বা কমানো : ঘরের আলোর সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে কম্পিউটার মনিটরের আলো কমানো বা বাড়ানো যাতে- মনিটরে লেখা গুলি দেখতে আরামদায়ক হয়।

৫) ঘন ঘন চোখের পলক ফেলুন : কম্পিউটারে কাজ করার সময় চোখের পলক পড়া কমে যায়। এর ফলে চোখের পানি কমে যায় ও চক্ষু শুষ্কতা বা ড্রাই আই হতে পারে। এ অবস্থায় চোখ শুষ্ক মনে হবে। কাটা কাটা লাগবে। চোখে অস্বস্তি ও ক্লান্তি আসবে। কম্পিউটার কাজের সময়- ঘন ঘন চোখের পলক ফেলুন। এরপরও সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চোখের কৃত্রিম পানি (Artificial Tears) ব্যবহার করুন।

৬) চোখের ব্যায়াম : ৩০ মিনিট কম্পিউটারে কাজ করার পর অন্যদিকে কিংবা দূরে তাকান। সম্ভব হলে ঘরের বাইরে কোথাও দেখুন এবং আবার নিকটে অন্য কিছু দেখুন। এভাবে চোখের বিভিন্ন ফোকাসিং-এ মাংশপেশির ব্যায়াম হবে। এভাবে কয়েকবার করে আবার কিছুক্ষণ কাজ করুন।

৭) মাঝে মধ্যে কাজের বিরতি দিন : কাজের মাঝে কয়েক মিনিটের জন্য বিরতি দিন। এক ঘন্টা কম্পিউটারে কাজ করে ৫-১০ মিনিটের বিরতি দিয়ে অন্য কোন দিকে দেখুন, বা অন্য কোন কাজে সময় কাটিয়ে আবার কম্পিউটারের কাজ শুরু করতে পারেন। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে ২ ঘন্টা একটানা কম্পিউটারে কাজ করে ১০-২০ মিনিটের বিরতি দিলেও একই রকম ফল পাওয়া যায়।

৮) কাজের জায়গার কিছু পরিবর্তন : কম্পিউটারে কাজ করার চেয়ারটি হাইড্রলিক হলে ভালো হয়, যাতে কাজের সময় চোখের উচ্চতা কম্পিউটার মনিটরের চাইতে সামান্য উঁচুতে থাকে। মনিটর চোখের বরাবর থাকতে হবে। মনিটর বাকা থাকলে অক্ষরগুলির পরিবর্তন (Distortion) হতে পারে যা চোখের ব্যাথার কারণ হতে পারে। অনেক সময় টাইপ করার কপিটি

এমন স্থানে রাখা হয় যাতে বারবার মনিটর থেকে অনেকখানি দূরে কপি দেখতে হয়। এতেও মাথা ব্যাথা ও চোখে ব্যাথা হতে পারে। মনিটরের পাশেই পরিমিত আলো ফেলে কপি স্ট্যান্ডে এই লেখাগুলি রাখা যেতে পারে। তাতে বারবার চোখের একোমোডেশন এর পরিবর্তন কম হবে ও কাজ আরামদায়ক হবে।

৯) কাজের ফাঁকে ফাঁকে ব্যায়াম : কম্পিউটারে কাজের সময় শুধু চোখের বা মাথার ব্যথা হয় না- অনেকেরই ঘাড়ের ব্যথা, কাধে ব্যথা, কোমরে ব্যথা এসব উপসর্গ হতে পারে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত পা ও কাঁধের নড়াচড়া করা হয় বা ব্যায়াম করা হয় তাহলে উপরের উপসর্গসমূহ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

**প্রশ্ন : ট্রাকোমা অন্ধত্ব কিভাবে হয় ?**

উত্তর : ট্রাকোমা জীবাণু এ.বি.সি ট্রাকোমাইটিস দ্বারা চোখের কনজাংকটিভা ও কর্ণিয়াতে বারবার আক্রান্ত হয়ে যদি কর্ণিয়া পুরোপুরি ঘোলা হয়ে যায় তাহলে তাকে বলে ট্রাকোমা জনিত অন্ধত্ব।

সৌভাগ্যবশত: বাংলাদেশে ট্রাকোমাজনিত অন্ধত্বের হার এখন অনেক কম। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ট্রাকোমার প্রভাব অনেক বেশি। সাধারণ চোখ ওঠা মনে করে অনেকে চিকিৎসার অবহেলা করে থাকেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একে ৫টি গ্রেডিং-এ ভাগ করেছে এবং সারা বিশ্ব থেকে এই রোগ দূর করার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ চক্ষু স্বাস্থ্য রক্ষা করা, ঘন ঘন মুখ ও চোখ ধোয়া, মাছি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা ইত্যাদি ট্রাকোমা রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে।

এই রোগের জন্য আজকাল এজিথ্রোমাইসন ও ইরাইথ্রোমাইসিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়।

**প্রশ্ন : শিশুদের ভিটামিন এ'র অভাবে চোখে কি কি অসুবিধা হয় ?**

উত্তর : শরীরের বিকাশের সাথে সাথে চোখের বিকাশ এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন-এ খুবই প্রয়োজন। ১ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে যদি দীর্ঘদিন ধরে ভিটামিন এ খাবারের সাথে না খায়, ডায়রিয়াজণিত কারণে এই ভিটামিনের

শোষণ ক্ষমতা লোপ পায় বা অন্য কোন কারণে ভিটামিন এ'র অভাব হলে- শিশুদের চোখের নানা সমস্যা দেখা দেয়।

১। রাতকানা - শিশুরা রাত্রে বা কম আলোতে চলার সময় ধাক্কা খায়, সঠিকভাবে চলতে বা দেখতে পায় না। রাত্রে দেখার জন্য ভিটামিন এ'র সাহায্যে রেটিনিন সাইকেল এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই ভিটামিনের অভাবে শিশুরা রাত্রে বা অন্ধকারে ভালো দেখতে পায় না।

২। ভিটামিন এ'র অভাব দীর্ঘদিন চলতে থাকলে চোখের কনজাংকটিভা শুকিয়ে যায় এবং বিটট স্পট দেখা যায়। আস্তে আস্তে কর্ণিয়াও শুকিয়ে যায় এবং কর্ণিয়ার ক্ষত হতে শুরু করে। ভালো চিকিৎসা না হলে কর্ণিয়া ছিদ্র হয়ে যায়, অনেক সময় কর্ণিয়া সম্পূর্ণ গলে চোখের আইরিশ বেরিয়ে আসে এবং রোগী সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়।

**প্রশ্ন : চোখের প্রদাহ আইরাইটিস হলে কিভাবে বুঝবো ?**

উত্তর : চোখের প্রদাহ আইরাইটিস- একটি মারাত্মক চোখের রোগ। অনেকে সাধারণ চোখ ওঠা মনে করে এই রোগের চিকিৎসা বিলম্ব করেন এবং অনেক জটিলতার সম্মুখীন হন।

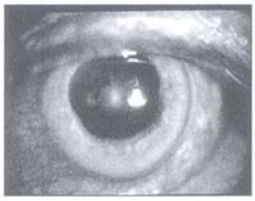

আইরাইটিস হলে- চোখ লাল হয়, ব্যাথা হয়, আলো ভীতি হয়, চোখে দেখার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এই সকল উপসর্গ থাকলে জরুরীভাবে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

আইরাইটিস রোগ এর সঠিক চিকিৎসা না হলে চোখে ছানি পড়তে পারে, সেকেন্ডারী গ্লকোমা হতে পারে, রেটিনায় পানি জমতে পারে। মাসের পর মাস বা বছর ধরে এই রোগে ভুগলে- চোখের পানি বা অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরী কমে গিয়ে চোখটি অত্যন্ত নরম (pthysical) হয়ে যেতে পারে এবং চোখে দেখাও একেবারে কমে যেতে পারে এমনকি অন্ধত্বও হতে পারে।

**প্রশ্ন : চোখে কি কোন ক্যানসার হয় ?**

উত্তর : চোখে অনেক দূরারোগ্য ক্যানসার হতে পারে। এছাড়া শরীরে অন্য কোন ক্যানসারও রক্তের মাধ্যমে চোখে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

চোখের বিভিন্ন অংশে যেমন- চোখের পাতায়, কনজাংকটিভায়, আইরিসে, করয়েড এবং রেটিনায় ক্যানসার হতে পারে। সবচেয়ে মারাত্মক হল 'রেটিনোব্লাসটোমা' যা চোখের রেটিনা থেকে উৎপত্তি হয়। প্রতি ১৭০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন শিশুর এই ক্যানসার হতে পারে। শিশুর ৩ বছর বয়সের পরে এই রোগের হার খুব কম। রেটিনোব্লাসটোমা বংশ পরম্পরায় ছড়াতে পারে।

শিশুদের চোখের মণি সাদা দেখা গেলে, চোখ লাল হয়ে পানি পড়তে থাকলে, চোখে দেখতে পারছে না বুঝলে, চোখের পাতা ফুলে বন্ধ হয়ে গেলে- চক্ষু বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নেয়া উচিত এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা উচিত। রেটিনোব্লাসটোমার ধাপ অনুযায়ী লেজার, কেমোথেরাপি ইত্যাদি দেয়া হয়। চোখে দেখার একেবারেই সম্ভাবনা না থাকলে এবং রোগটি ব্রেনে বা অন্য কোথাও ছড়িয়ে যাবার ভয় থাকলে- ঐ চোখটি তুলে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে।

**প্রশ্ন : চোখের কি কি জন্মগত ত্রুটি হতে পারে ?**

উত্তর : চোখের প্রায় প্রতিটি অংশেই জন্মগত ত্রুটি হতে পারে। কিছু ত্রুটি চিকিৎসার যোগ্য নয় তবে বেশিরভাগ জন্মগত ত্রুটি দ্রুত রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করালে চির অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

পূরো চোখ তৈরী না হওয়া (Anophthalmos), ছোট চোখ (Microphthalmos) চোখের পাতা অংশবিশেষ তৈরী না হওয়া, চোখের কর্ণিয়া ছোট বা বড় হওয়া, কোনিকেল বা ফ্লাট কর্ণিয়া, লেন্স ঘোলা হওয়া বা জন্মগত ছানি, আইরিস, করয়েড ও রেটিনার ত্রুটি, জন্মগত গ্লকোমা ইত্যাদি নানা প্রকার জন্মগত চোখের ত্রুটি হতে পারে। জন্মগত ছানি, গ্লকোমা রোগে দ্রুত শল্য চিকিৎসা করানো হলে দৃষ্টিশক্তি প্রায় ১০০ ভাগ ভালো করা সম্ভব।

**প্রশ্ন : জন্মগত চোখের ছানির চিকিৎসা কি ?**

উত্তর : সাধারণত: বয়স্কদেরই চোখে ছানি পড়ে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের নানা প্রকার অসুখে বা কোন ওষুধ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় শিশু চোখের ছানি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

যেহেতু ছানি হচ্ছে চোখের লেন্স ঘোলা হয়ে যাওয়া, ছানি পড়লে শিশুর চোখে আলো প্রবেশ করতে পারে না। এতে শিশু চোখে দেখে না এবং তার রেটিনার বিকাশও ঘটে না।

সুতরাং জন্মগত ছানি- যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা করতে হবে। ছানির চিকিৎসা হচ্ছে- অপারেশন করে ঐ ঘোলা লেন্সটি অপসারণ করতে হবে। বয়স ২ বছর না হলে কৃত্রিম লেন্স বসানো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ- এজন্য এসব শিশুদেরকে অপারেশন এর পর চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স এর সাহায্যে দেখার ব্যবস্থা করা হয় এবং বড় হলে ৭/৮ বছর বয়সে চোখে ২য় বার অপারেশন করে কৃত্রিম লেন্স সংযোজন করা হয়।

**প্রশ্ন : জন্মগত চোখের গ্লকোমা রোগের কোন চিকিৎসা আছে কি ?**

উত্তর : হ্যাঁ- জন্মগত গ্লকোমা রোগের ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। তবে তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শল্য চিকিৎসা। অন্যান্য গ্লকোমা রোগে যেমন চোখের ফোঁটা ওষুধ, লেজার এর সাহায্যে চিকিৎসা করা সম্ভব- জন্মগত গ্লকোমার ক্ষেত্রে তা প্রায় অকার্যকর।

জন্মগত গ্লকোমা হলে শিশুর চোখ অনেক বড় হয়ে যায় কিছুটা গরুর চোখের মত দেখায়। এজন্যে ঐ ধরনের চোখকে বলা হয়- বুফথ্যালমস (Buphthalmos)। জন্মগত চোখের জন্মগত ত্রুটির কারণে এই জন্মগত গ্লকোমা হয়ে থাকে। শিশুদের চোখ বড় হবার সাথে সাথে- চোখ দিয়ে পানি পড়ে, চোখের চাপ বেড়ে কর্ণিয়া ঘোলা হয়ে যায়। দ্রুত চিকিৎসা করা না হলে চিরতরে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে চোখের চাপ কমাবার ওষুধ ব্যবহার করে যত দ্রুত সম্ভব একজন গ্লকোমা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে শল্য চিকিৎসা করা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোখের চাপ কমে যায় এবং শিশুর চোখ আস্তে আস্তে ভালো হয় এবং দেখারও উন্নতি হয়।

**প্রশ্ন : অনেকে চোখের সামনে কালো স্পট দেখেন- এর কারণ কি ?**

উত্তর : চোখের পিছনে কালো স্পট দেখা বেশ সাধারণ একটা চোখের উপসর্গ। যাদের মাইনাস পাওয়ার এর চশমা লাগে তারাই বেশি স্পট দেখতে পান। চোখের নড়াচড়ার সাথে সাথে এই স্পটগুলিও নড়াচড়া করে। সাধারণত: চোখের ভিট্রিয়াস জেলের মধ্যে তিলের মত বস্তু তৈরী হয় (degenerative change)। সারা জীবনেও এই স্পটগুলি চোখের ক্ষতি করে না বা দৃষ্টিরও পরিবর্তন হয় না। কয়েকটি চোখের রোগ যেমন- রেটিনার ডিটাচমেন্ট, রেটিনার পানি জমে যাওয়া,

ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, লেন্সের মধ্যভাগে ছানি পড়া ইত্যাদি নানা কারণেও চোখের সামনে কালো স্পট দেখা যায়। যেহেতু মারাত্মক চোখের রোগেও চোখের সামনে কালো স্পট দেখা যায়- সেজন্য এসকল উপসর্গ থাকলে অন্তত: একবার চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে নেয়া উচিত।

**প্রশ্ন : হঠাৎ করে চোখে না দেখার কারণ কি ?**

উত্তর : জীবনে কেউ যদি কোনও সময়ে হঠাৎ করে এক চোখে কিংবা ২ চোখে না দেখতে পান- তাহলে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ দিয়ে সম্পূর্ণ চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। চোখের নানা কারণে এ ধরনের উপসর্গ হতে পারে। যেমন- শিশুদের ক্ষেত্রে অপটিক নার্ভের অসুখ- ডেভিকস ডিজিজ, অপটিক নিউরাইটিস ইত্যাদি। বড়দের ক্ষেত্রে- যে কোন কারণে চোখের ভিতরে রক্তক্ষরণ, রেটিনার ডিটাচমেন্ট, রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া, অপটিক নিউরাইটিস, গ্লকোমা, অপটিক নার্ভ এর সেন্ট্রাল ধমনি বন্ধ হয়ে যাওয়া- ইত্যাদি নানা কারণে হঠাৎ করেই চোখে দেখা না যেতে পারে। এসব কারণের বেশিরভাগই চিকিৎসা করা সম্ভব। সুতরাং যে কোন কারণে হঠাৎ করে না দেখতে পারলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

**প্রশ্ন : চোখে মাঝে মধ্যে 'ব্লাক আউট' হবার কারণ কি ?**

উত্তর : বাহ্যিক চোখের কোন রোগ ছাড়াই যদি কেউ হঠাৎ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্য কিছু দেখতে না পান বা 'ব্লাক আউট' হয় তার নাম "অ্যামোরোসিস ফিউগাক্স' (Amaurosis Fugax)।

অনেকক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ উঠে দাড়ালে, পাইলটদের ক্ষেত্রে অনেক উচ্চতায় উঠে গেলে এরকম ব্লাক আউট হতে পারে।

এছাড়া মাইগ্রেন, রেনডস ডিজিজ, গর্ভবতী অনেক মায়েদের চোখের রেটিনার রক্তাল্পতা হয়ে এরকম 'ব্লাক আউট' হতে পারে।

**প্রশ্ন : চোখের মধ্যে কি কৃমি হতে পারে ?**

উত্তর : মাঝে মধ্যে চোখে খুব ক্ষুদ্রাকৃতির কৃমি পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার প্যারাসাইট সরাসরি চোখে রক্তের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে। ম্যালেরিয়া হলে অনেক সময়- কর্ণিয়ার বৃক্ষাকৃতির আলসার হয়, রেটিনার ধমনিতে এম্বোলিজম হয়ে ধমনী বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

টক্সোপ্লাজমোসিস, টক্সোক্যারিয়েসিস, টিনিয়া ইত্যাদি প্যারাসাইট চোখের নানা অংশে আক্রান্ত হতে পারে। চোখের কোটরে, কনজাংকটিভা, ভিট্রিয়াস ও রেটিনার 'সিস্ট' তৈরী করতে পারে। ম্যাকুলা ও অপটিক নার্ভের মুখে পানি জমে যেতে পারে। করয়েড ও রেটিনায় প্রদাহ হয়ে ক্ষত হতে পারে। সঠিক রোগ নির্ণয় হলে ও ওষুধ ব্যবহার করলে চোখের এই প্যারাসাইট বা কৃমি জাতীয় প্রদাহ হতে নিরাময় হওয়া সম্ভব।

**প্রশ্ন : চোখ দেখে কি মস্তিষ্কের টিউমার বোঝা যায় ?**

উত্তর : অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের মধ্যে টিউমার বা রক্তক্ষরণ হলে চোখের পরীক্ষায় তার উপসর্গ ধরা পড়ে। এ জন্যেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ প্রথম মস্তিষ্কের টিউমার সন্দেহ করে নিউরোলজিস্ট বা নিউরোসার্জনদের নিকট রেফার করেন।

মস্তিষ্কের কোন টিউমার হলে বা রক্তক্ষরণ হলে তা সরাসরি অপটিক নার্ভ থেকে ব্রেন পর্যন্ত চোখে দেখার গতিপথে চাপ পড়তে পারে এবং রোগীর দৃষ্টির কিংবা দৃষ্টির পরিসীমার মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। চোখের স্নায়ুতে চাপ পড়ে চোখ বাঁকা (ট্যারা) হয়ে যেতে পারে। চোখের ভেতরে কিংবা বাইরে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

ব্রেনের মধ্যে চাপ বেড়ে গেলে- চোখের অপটিক নার্ভের মুখে পানি জমতে পারে- যাকে বলা হয় প্যাপিলোইডিমা। এরকম নানা উপসর্গ দেখে চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ ব্রেনের টিউমার বা রক্তক্ষরণ বুঝতে পারেন।

**প্রশ্ন : 'ডবল ভিশন' বা দুইটি করে জিনিস দেখার কারণ কি ?**

উত্তর : একটা বস্তুকে ২টি করে দেখলে তাকে বলে ডবল ভিশন বা ডিপলোপিয়া। যদি দুই চোখ খোলা থাকা অবস্থায় দুইটি করে দেখা যায় তাকে বাইনোকুলার ডিপলোপিয়া বলা হয়। যদি এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে ২টি করে দেখা যায় তাকে বলা হয় ইউনিকুলার ডিপলোপিয়া। চোখের ছানির প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকেই চাঁদ, তারা দুইটি করে দেখার কথা বলে থাকেন।

ডায়াবেটিস সহ নানা অসুখে চোখের মাংশপেশী বা স্নায়ুর দুর্বলতা, চোখের টিউমার ইত্যাদি নানা কারণে বাইনোকুলার ডিপলোপিয়া হতে পারে। ট্যারা চোখেও ডিপলোপিয়া হতে পারে। কারণ দূরীভূত করে ভিটামিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে এ ধরনের ডিপলোপিয়া ভালো হতে পারে।

নার্ভ প্যারালাইসিস যদি ভালো না হয় এবং ডিপলোপিয়া দীর্ঘমেয়াদী হয় তাহলে চোখে শল্য চিকিৎসা করার প্রয়োজন হতে পারে।

**প্রশ্ন : অনেকের চোখ অনবরত নড়ে- এর কারণ কি ?**

উত্তর : চোখ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে সব সময় নড়তে থাকে তাকে 'নিসটাগমাস' বলা হয়। যারা চোখে ভালো দেখেন না, চোখের জন্মগত কয়েকটি ত্রুটিতে, কানের কোন ত্রুটি থাকলে এরকম চোখ নড়ার সমস্যা দেখা যায়। এদেরকে বলা হয় প্যাথোলজিক্যাল নিসটাগমাস। সাধারণ সুস্থ্য শিশুরা সর্বোচ্চ বাইরের দিকে তাঁকায় বা কেউ যদি চলন্ত ট্রেনে বা বাসের মধ্যে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন- তখনও চোখ নড়ে। এ অবস্থাকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল নিসটাগমাস।

প্যাথলজিক্যাল নিসটাগমাসের কারণ খুঁজে সম্ভব হলে তার চিকিৎসা করতে হবে। তাতে চোখে দেখার কিছু উন্নতি হতে পারে, কিন্তু চোখ নড়ার তেমন উন্নতি হয় না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিসটাগমাস এর প্রবণতা ও হার অনেকটাই কমে যায়।

**প্রশ্ন : চোখের 'অঞ্জনি' কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ভালো হয় ?**

উত্তর : চোখের পাতার একটি সাধারণ রোগ চোখের 'অঞ্জনি'। চোখের পাতায় থাকা 'মেবোমিয়ান' গ্রন্থির প্রদাহ হলে তা ফুলে যায়- যাকে আমরা বলি 'অঞ্জনি'। ঐ গ্রন্থির কয়েকটি নালি বন্ধ হলে 'অঞ্জনি' বড় হতে থাকে। আবার ঐ নালী আপনা আপনি খুলে গেলে 'অঞ্জনি' ভালো হয়ে যায়।

সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অঞ্জনি প্রাকৃতিক নিয়মেই ভাল হয়- কোন ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় অঞ্জনিতে ইনফেকশন হয়, ব্যথা হয় এবং ফেটে যায়, সেক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে ওষুধ ব্যবহার করা উচিত এবং কখনো কখনো অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে।

**প্রশ্ন : চোখের এলার্জি হলে কি ঠান্ডা পানি ভালো কাজ করে ?**

উত্তর : চোখের এলার্জি হলে অনেকেই চোখে খুব ঠান্ডা পানি ব্যবহার করেন। ঠান্ডা পানি ওষুধ-এর মত ভালো কাজ করে না তবে এতে কোন ক্ষতি নেই।

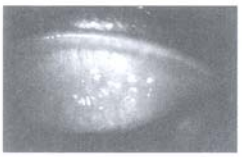

চোখের এলার্জি হলে চোখ লাল হয়, চোখের রক্তনালীগুলি বড় হয় ও ফুলে যায়। ঠান্ডা পানি চোখে দিলে ঐ রক্তনালীগুলি কিছুটা সংকুচিত হয়, ফলে লাল কমে যেতে পারে, এলার্জিক বস্তুর নিঃসরণ কমে যেতে পারে। এতে রোগীর উপসর্গ অনেকটাই কমে যেতে পারে এবং চোখে আরাম অনুভূত হতে পারে।

**প্রশ্ন : চোখে এসিড নিক্ষেপ করা হলে তার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা কি ?**

উত্তর : চোখের মধ্যে এসিড বা অম্ল জাতীয় পদার্থ গেলে তা চোখের জন্য একটি অতি জরুরী বিষয় কারণ তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা করা না হলে চোখের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য- আমাদের দেশে এখনও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। ফলে মুখে-চোখে বা শরীরে এসিড লেগে অনেক ক্ষতি করে। আজকাল ছিনতাইকারীরাও এসিড জাতীয় পদার্থ ও মরিচের গুড়া চোখে দিয়ে দেয়।

যে কোন কারণে চোখে এসিড গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিস্কার করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ ধুতে হবে। কাছাকাছি যেখানেই পানি পাওয়া যাবে, সেখানে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ পানি চোখে দিতে হবে। এরপর চোখের এন্টিবায়োটিক ফোঁটা ও মলম ব্যবহার করতে হবে। এসিড জাতীয় পদার্থ চোখে গেলে চোখের কনজাংকটিভা, কর্ণিয়া ও অন্যান্য অংশ একে অপরের সাথে লেগে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে যা থেকে দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে। এ ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য এসিড বা অ্যালকালি জাতীয় পদার্থ চোখে পড়লে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নিতে হবে।

**প্রশ্ন : চোখে চুন পড়লে তার চিকিৎসা কি ?**

উত্তর : চোখে কোন কারণে চুন পড়লে চিকিৎসা করা জরুরী। যারা পান-চুন খান তাদের ক্ষেত্রে এরকম দুর্ঘটনা অনেক বেশি পাওয়া যায়।

চুন হচ্ছে ক্ষার জাতীয় পদার্থ। চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের কর্ণিয়া, কনজাংকটিভা কেমিক্যাল বার্ণ হয়ে যায় এবং কোষকে ধ্বংস করে চোখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আইরিস ও লেন্সের ক্ষতি করে। সুচিকিৎসা না হলে দৃষ্টিশক্তির অনেক অবনতি হয়।

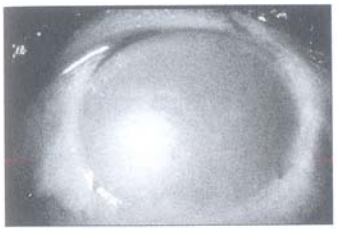
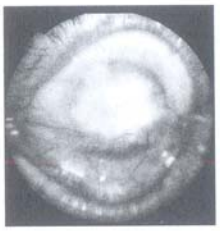

চোখে চুন জাতীয় পদার্থ পড়লে সাথে সাথে পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে। আশে পাশে যেখানেই পানি পাওয়া যায়- তা দিয়ে অনেকক্ষণ চোখ ধুতে হবে। কাছাকাছি কোন ক্লিনিক থাকলে সেখানে গিয়ে আরও ভালো করে দেখে দেখে চোখ ধুতে হবে। যতটা সম্ভব চুন পরিস্কার করার পর চোখে এন্টিবায়োটিক ফোঁটা ওষুধ ও মলম ঘন ঘন ব্যবহার করতে হবে। এতেও চোখের সমস্যা দূরীভূত না হলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

**প্রশ্ন : অনেকের চোখের উপরের পাতা ঝুলে যায় বা চোখ ছোট হয়ে যায় এর কারণ কি ?**

উত্তর : চোখের উপরের পাতা অস্বাভাবিকভাবে নেমে গেলে বা ঝুলে পড়লে তাকে বলা হয়- টসিস। এই সমস্যাটি জন্মগত হতে পারে তবে বেশিরভাগ সময়ে জন্মের পরে স্নায়ুজনিত দুর্বলতা, মাংশপেশীর দুর্বলতা বা অন্য কারণে হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস সহ কয়েকটি রোগে ৩য় ক্রানিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস হলে চোখের উপরের পাতা পড়ে যায়। বয়স্কদের পাতার দুর্বলতার জন্য পাতা পড়ে যায় বা চোখ ছোট হয়ে যায়। মাইয়েসথেনিয়া গ্রাভিস সহ কয়েকটি মাংশপেশীর রোগেও চোখের উপরের পাতা এমনকি নিচের পাতাও পড়ে যায়। চোখের উপরের পাতায় কোন

টিউমার বা অঞ্জনী হলেও মেকানিক্যাল টসিস হতে পারে।

টসিসে চোখের মণি পুরা ঢেকে যেতে পারে কিংবা আংশিক ঢেকে যেতে পারে। পুরা ঢেকে গেলে টসিসের কারণ-এর চিকিৎসা করতে হবে। জন্মগত পূর্ণ টসিস থাকলে কিংবা সৌন্দর্য বর্ধন এর জন্য টসিসের শল্য চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়।

**প্রশ্ন : নবজাতক শিশুদের চোখ দিয়ে পানি পড়ে কেন ?**

উত্তর : অনেক শিশুদের জন্মের পর থেকে বা কয়েকদিন পর থেকে অনবরত পানি পড়তে থাকে। কখনও আবার পানির সাথে ময়লাও আসে।

চোখের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ল্যাকরিমাল ও অতিরিক্ত ল্যাকরিমাল গ্রন্থি হতে চোখের পানি তৈরী হয়ে তা চোখের উপরে আসে এবং চোখকে সতেজ রাখে। এই পানি চোখের পাশে নাকের দিকে ২টি ছিদ্র বা পাংটাম দিয়ে ন্যাসোল্যাকরিমাল ডাক্ট বা নেত্রনালীর মধ্য দিয়ে নাকে প্রবেশ করে।

সাধারণত: মায়ের গর্ভেই শিশুদের ঐ নেত্র নালী সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যায়। কোন কোন নবজাতক এর নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই ভূমিষ্ট হবার কারণে বা অন্য কোন কারণে ঐ নালী সম্পূর্ণ তৈরী হয় না। এর ফলে চোখের পানি নাকে বেরিয়ে যেতে বাধাগ্রস্ত হয়ে চোখ দিয়ে পড়ে।

নিয়মানুযায়ী প্রায় ৯৫ ভাগ এরকম শিশুর নালী এক বছর বয়সের পূর্বেই তৈরী হয়ে যায় এবং পানি পড়া ভালো হয়ে যায়। তবে চোখের পাশে চাপ দিলে বা ম্যাসেজ করে এন্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব।

মাত্র ১-৫ শতাংশ শিশুর জন্য প্রবিং বা নেত্রনালীর শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। অতি সম্প্রতি লেজার-এর সাহায্যেও নেত্রনালী বন্ধের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

**প্রশ্ন : চোখের কোটর থেকে চোখ বেরিয়ে আসে কেন ?**

উত্তর : চক্ষুগোলকটি খুব নিরাপদভাবেই চোখের কোটরে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন দিকে তাকাতে সুবিধা হয়। চক্ষুগোলকের পেছনে, পাশে মাংশপেশী, রক্তনালী, গ্রন্থি, চর্বি ইত্যাদি থাকে। কোন কারণে এসব অংশে- কোন পরিবর্তন হয়ে আকারে বড় হয়ে গেলে- চোখ সামনের দিকে বেরিয়ে আসে। এই অবস্থাকে বলা হয় প্রপটোসিস।

চোখের পেছনের কোন নার্ভ বা এর পর্দার টিউমার যেমন- অপটিক নার্ভ গ্লাইওমা, মেনিনজিওমা, মাংশপেশীর টিউমার র‍্যাবডোমাইওসারকোমা, ল্যাকরিমাল গ্রন্থির টিউমার, রক্তনালীর টিউমার, হেমাঞ্জিওমা, লিম্ফোমা ইত্যাদি নানা কারণে চোখ বেরিয়ে আসতে পারে। কোটরের প্রদাহ অরবিটাল সেলুলাইটিস রোগেও চোখ সামনের দিকে বেরিয়ে আসতে পারে।

শরীরে থাইরয়েড হরমোন বেশি হলে বা হাইপারথাইরয়েডিজম হলে চোখের কোটরে প্রচুর পরিমাণ মিউকোপলিস্যাকারাইড জমে, মাংশপেশীর প্রসারণ হয় এবং ২ চোখই একত্রে সামনে চলে আসে। এই অবস্থার নাম এক্সোফথ্যালমোস। যে কোন কারণেই হোক না কেন চোখ বেরিয়ে আসলে চোখের কর্ণিয়া শুকিয়ে যায়- কর্ণিয়ার আলসার হয়, অপটিক নার্ভে টান পড়ে তা শুকিয়ে যায়। সময়মত চিকিৎসা করা না গেলে বিভিন্ন জটিলতা থেকে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

**প্রশ্ন : 'কালার ব্লাইন্ড' বা বর্ণান্ধ কেন হয় ?**

উত্তর : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণান্ধ বা কালার ব্লাইন্ড জন্মগত চোখের ত্রুটি। এই রোগে দুই চোখই আক্রান্ত হয় এবং কোন চিকিৎসা নেই।

জন্মগত কালার ব্লাইন্ড দুই প্রকার হতে পারে।

ক) আংশিক বা পারসিয়াল কালার ব্লাইন্ড। এই প্রকার রোগীরা লাল, সবুজ কিংবা নীল রং চিনতে পারেন না। এর মধ্যে সবুজ কালার ব্লাইন্ডই বেশি দেখা যায়।

খ) পুরাপুরি বা টোটাল কালার ব্লাইন্ড- এই প্রকার রোগীরা কোন প্রকার রংই চিনতে পারেন না এবং সব কিছুই ধুসর দেখেন। সৌভাগ্যবশত: এই প্রকার কালার ব্লাইন্ড এর সংখ্যা সবচেয়ে কম।

জন্মগত কালার ব্লাইন্ড ছাড়াও অনেক অসুখে এবং কয়েকটি ওষুধ সেবনের ফলে চোখের অপটিক নার্ভ ও ম্যাকুলার পরিবর্তন হয়েও বর্ণান্ধ হতে পারে।

**প্রশ্ন : বৈদ্যুতিক শকে চোখের কি কোন ক্ষতি হয় ?**

উত্তর : হ্যাঁ- বৈদ্যুতিক শকে- অনেকক্ষেত্রে চোখের লেন্স ঘোলা হয়ে যেতে পারে বা ছানি পড়ে যেতে পারে। এ জাতীয় ছানিকে বলা হয়- ইলেকট্রিক ক্যাটারাক্ট। বৈদ্যুতিক শক পাবার পরপরই সাধারণত: চোখে কোন সমস্যা বোঝা যায় না। খুব ধীরে ধীরে চোখের লেন্সের কোষের পরিবর্তন করে ফোটা ফোটা আকারে লেন্স

ঘোলা হতে থাকে এবং সাথে সাথে রোগীরও দেখার অবনতি হতে থাকে। অনেক সময়- বৈদ্যুতিক শকের ৭-৮ বছর পর রোগী কম দেখা শুরু করেন এবং আরো ২/৩ বছর পর পুরো লেন্সটাই ঘোলা হয়ে যায়, দেখার অনেক অবনতি ঘটে।

এ জাতীয় 'ইলেকট্রিক ক্যাটারাক্ট' ফ্যাকো সার্জারী করে ও কৃত্রিম লেন্স সংযোজন করলে পূর্বের ন্যায় দেখার উন্নতি হয়।

**প্রশ্ন : চোখের নার্ভ প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত হলে কি হয় ?**

উত্তর : চোখে আঘাতজনিত কারণে কিংবা শরীরের কয়েকটি রোগে বিশেষ করে ডায়াবেটিসে চোখের ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ক্রানিয়াল নার্ভ এর প্যারালাইসিস হতে পারে। এ সকল নার্ভ এর কাজ হচ্ছে চোখকে খুলে রাখা এবং ডানে, বামে, উপরে নিচে ঘোরানো।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি নার্ভই প্যারালাইসিস হয় এবং সেই নার্ভের যে মাংশপেশি তা অকার্যকর হয়। যেমন ৬ষ্ঠ নার্ভ প্যারালাইসিস হলে চোখ বাইরের দিকে ঘুরতে পারে না। ৩য় নার্ভ প্যারালাইসিস হলে চোখের উপরের পাতা পড়ে যায়, নাকের দিকে ঘোরে না, উপরে তাকাতে সমস্যা হয়। কোন কোন সময় এই ৩টি নার্ভ একত্রে প্যারালাইসিস হয়ে চোখের সকল গতিচাঞ্চল্য কমিয়ে দেয়। এই নিশ্চল চোখকে বলা হয়- টোটাল অফথ্যালমোপ্লেজিয়া।

ডায়াবেটিসের কারণে চোখের পক্ষাঘাত হলে তা ৩-৬ মাসের মধ্যে সাধারণত: আবার ভালো হয়ে যায়। ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে অবশ্য উন্নতি হতে দেরি হয়।

**প্রশ্ন : কৃত্রিম চক্ষু সংযোজন কি সম্ভব ?**

উত্তর : পুরো চোখ তুলে ফেলার পর কোন কৃত্রিম চক্ষু সংযোজন ব্যবস্থা এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। চক্ষু সংযোজন বলতে শুধুমাত্র কর্ণিয়া সংযোজনকে বোঝায়।

চোখের কৃত্রিম লেন্স আবিস্কার- ছানি চিকিৎসায় যেমন যুগান্তকারী এবং অভাবনীয় উন্নতি সাধন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি কৃত্রিম কর্ণিয়া ও কৃত্রিম চোখ আবিস্কার এর উপর প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। কৃত্রিম লেন্স আবিস্কার এর মত কৃত্রিম কর্ণিয়া ও কৃত্রিম চোখ আবিস্কারও একদিন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

**প্রশ্ন : উচ্চ রক্তচাপে থেকে চোখে কি কোন জটিলতা হতে পারে ?**

উত্তর : উচ্চ রক্তচাপ অনেকদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত থাকলে যেমন হার্টে, ব্রেনে, কিডনিতে জটিলতা হতে পারে- তেমনি চোখেও নানা জটিলতা হতে পারে।

অল্পবয়স্ক রোগী, গর্ভবতী মায়েদের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে- হঠাৎ করে 'ব্লাক আউট' হতে পারে। সাধারণত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চোখের দেখা আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই বয়সে রেটিনার রক্তনালী সংকোচন ও প্রসারণ হবার ফলে ব্লাক আউট হয়ে থাকে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রক্তনালীগুলি তুলনামূলক শক্ত হয়ে যায়- চিকন হয়ে যায়। রেটিনার রক্তনালী থেকে খুব ধীরে ধীরে পানি, চর্বি জাতীয় পদার্থ, এমনকি রক্তক্ষরণও হতে পারে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি।' বিভিন্ন ধাপ অনুযায়ী এই রেটিনোপ্যাথির বর্ণনা করা হয় এবং চিকিৎসা করা হয়। উচ্চ রক্তচাপে- চোখের জটিলতা হলে- প্রথমেই রক্তচাপ ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চোখের রংগীন ছবি এবং অ্যাঞ্জিওগ্রাফী (FFA) করে প্রয়োজনে লেজার চিকিৎসা করতে হবে।

**প্রশ্ন : গর্ভবতী মায়েদের চোখে কি কি সমস্যা হতে পারে ?**

উত্তর : স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় চোখে তেমন কোন জটিলতা হয় না। রেটিনায় রক্তনালীর মাঝে মাঝে সংকোচন হবার ফলে রোগী হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঝাপসা দেখতে পারেন। যাকে 'ব্লাক আউট' বলা হয়। ঠিকমত বিশ্রাম ও দুর্বলতার ওষুধ খেলে এ অবস্থার উন্নতি হয়।

তবে গর্ভবতী মায়েদের উচ্চ রক্তচাপ একলামসিয়া হলে অনেক সময় চোখে সমস্যা হতে পারে। রোগীর বয়স কম থাকায় উচ্চ রক্তচাপে চোখের রক্তনালীর অনেক পরিবর্তন হয়, রক্তনালীর প্রসারণ হয়ে রক্তক্ষরণ ও পানি জাতীয় পদার্থ নির্গত হয়। অনেক পানি জমে গেলে- এক ধরনের রেটিনার ডিটাচমেন্ট হতে পারে।

চোখে এ জাতীয় জটিলতা দেখা গেলে এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিলে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে 'সিজারিয়ান সেকশন' অপারেশন এর মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করানো উচিত। বাচ্চা ভূমিষ্ট হলে মায়ের চোখের জটিলতাগুলি কমে যায়।

**প্রশ্ন : রক্তশূন্যতা হলে চোখের কি জটিলতা হতে পারে ?**

উত্তর : রক্তশূন্যতা হলে শরীরের অন্যান্য সমস্যার সাথে চোখেও জটিলতা হতে পারে, চোখ দেখতে অনেক ফ্যাকাসে মনে হবে। চিকিৎসকগণ রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া বোঝার জন্য চোখের পাতা উল্টিয়ে কনজাংকটিভার রং, রক্তের পরিমাণ, রক্তনালীর অবস্থা ইত্যাদি পরীক্ষা করে থাকেন।

রক্তশূন্যতা হলে শরীর-এর সকল রক্তনালীর মত চোখের ভিতরে ও বাইরের রক্তনালীগুলি ফুলে যায় এবং রক্তক্ষরণ হয়। চোখের বাইরের রক্তক্ষরণ বা সার কনজাংকটিভাল রক্তক্ষরণ সাধারণত দৃষ্টির কোন ক্ষতি করে না তবে চোখের ভেতরে- রেটিনার রক্তক্ষরণ বার বার হলে দৃষ্টিশক্তি অনেক কমে যেতে পারে।

এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতার চিকিৎসা করালে চোখের জটিলতাও কমে যায় এবং দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়।

**প্রশ্ন : চোখের ভেতর পানি জমে কেন ?**

উত্তর : বলতে গেলে অজ্ঞাত কারণে অনেক সুস্থ যুবক ও মধ্যবয়সী পুরুষদের চোখের রেটিনায় পানি জমে, চোখের সামনে কালো স্পট দেখতে পান, দেখার অবনতি হয়। মেয়েদের এই চক্ষু সমস্যা খুবই কম।

কয়েকটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে- মানসিক চাপ, উচ্চ রক্তচাপ, এস.এল.ই রোগ থাকলে এবং স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেলে- এই রোগ বেশি হয়।

সাধারণত এক চোখেই সমস্যা শুরু হয়। রোগী চোখের সামনে কালো স্পট ছাড়াও, সবকিছু আকাবাকা দেখতে পারেন। দৃষ্টিশক্তি ৬/৯ থেকে ৬/১৮ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

চোখের রেটিনার কেন্দ্রে বা ম্যাকুলাতে জমা এই পানি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজে নিজে শোষিত হয়ে ভালো হয়ে যায়। তবে যদি ২/৩ মাসেও ভালো না হয় তাহলে চোখের অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (FFA) করে রেটিনায় কোন রক্তনালীর ছিদ্র পাওয়া গেলে তা লেজার এর সাহায্যে চিকিৎসা করতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে ভালো হয়ে গেলেও এ রোগ একই চোখে বার বার হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে লেজার চিকিৎসার ফলাফল সন্তোষজনক।

**প্রশ্ন : 'এইডস' রোগে চোখের কি কি জটিলতা হতে পারে ?**

উত্তর : এইচ.আই.ভি নামক ভাইরাস দিয়ে এইডস (Acquired Immunodeficiency Syndrome) রোগ হয়। এই রোগে শরীরের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কমিয়ে দেয়- শরীরে নানা প্রকার প্রদাহ ও জটিলতার শিকার হয়ে রোগী মারা যান।

এই রোগে চোখেও মারাত্মক জটিলতা হতে পারে। চোখের পাতায়, কর্ণিয়া ও কনজাংকটিভাতে 'ক্যাপোসিস সারকোমা' নামক টিউমার হতে পারে। এছাড়া চোখের কোটরে, কর্ণিয়াতে, ইউভিয়াল টিস্যু এবং রেটিনাতে মারাত্মক প্রদাহ হতে পারে। চোখের বিভিন্ন প্রদাহ এবং রেটিনায় রক্তক্ষরণ ও সাদা সাদা এগজুডেট জমে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

**প্রশ্ন : চোখের 'মরনিং গ্লোরি' সিনড্রোম কাকে বলে ?**

উত্তর : 'মরনিং গ্লোরি সিনড্রোম' চোখের এক ধরনের জন্মগত ত্রটি। শিশু বয়সেই এ রোগ ধরা পড়ে। এই সিনড্রোমে চোখের ভেতরে অপটিক ডিস্ক দেখতে মরনিং গ্লোরি ফুলের মত মনে হয়।

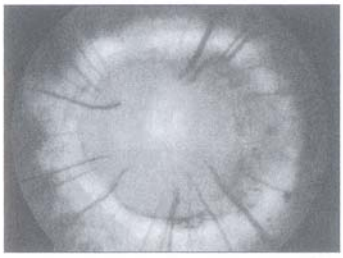

চোখের রেটিনার প্রায় কেন্দ্রভাগে রয়েছে অপটিক ডিস্ক। রেটিনা থেকে নার্ভগুলো একত্র হয়ে এই অপটিক ডিস্কে অপটিক নার্ভ তৈরী হয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে ব্রেনে যায়। এই নার্ভের মধ্যে রক্তনালীগুলি একটি নিয়মের মধ্যে থাকে। মরনিং গ্লোরি সিনড্রোমে রক্তনালীগুলি অস্বাভাবিকভাবে সাইকেলের স্পোক এর মত বিস্তৃত থাকে। ঐ রক্তনালীসহ অপটিক ডিস্ক দেখতে ফুলের মত মনে হয়।

চোখের এই সমস্যার সাথে সাধারণত শিশুদের নাক বোঁচা, চোখ ২টির বেশি দূরত্ব, ঠোঁট বাঁকা, ব্রেনের জন্মগত সমস্যা ইত্যাদি থাকতে পারে। এই রোগে বেশিরভাগ শিশু চোখে কম দেখে। সৌভাগ্যবশত: এই রোগের হার খুবই কম।

**প্রশ্ন : চোখের কোন্ কোন্ সমস্যায় সত্বর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত ?**

উত্তর : কয়েকটি চক্ষুরোগে সত্বর বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নেয়া হলে- দৃষ্টিশক্তির ক্ষতিকর জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন-

১। হঠাৎ করে চোখে না দেখলে বা কম দেখলে।

২। চোখ লাল হয়ে- ব্যথা করলে, আলো ভীতি হলে এবং দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে।

৩। একজন সাধারণ চিকিৎসক যদি প্রাথমিকভাবে মনে করেন রোগীর গ্লকোমা, পেকে যাওয়া চোখের ছানি, কর্ণিয়ার আলসার, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, চোখের প্রদাহ ইত্যাদি হতে পারে তাহলে রোগীকে সত্বর চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এর জন্য পাঠাতে হবে।

**প্রশ্ন : কর্ণিয়ার আলসার বা চোখে ক্ষত হলে কি করণীয় ?**

উত্তর : আমাদের দেশে অন্ধত্বের ২য় প্রধান কারণ চোখের কর্ণিয়ার আলসার বা চোখের ক্ষত। সাধারণত: গ্রামাঞ্চলে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কর্ণিয়ার আলসার এর হার বেশি। কৃষি মৌসুমে কৃষকদের চোখে আলসার হয় অনেক বেশি। জীবাণুর

প্রকারভেদে- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াল ও ফাংগাল কর্ণিয়ার আলসার হতে পারে। সঠিক সময়ে ও সঠিক চিকিৎসা না হলে এই আলসার থেকে চোখের ব্যাপক সংক্রমন ও প্রদাহ হয়ে যায় এবং অনেক সময় চোখের যন্ত্রণা কমাতে চোখ তুলে ফেলার প্রয়োজন হয়।

সুতরাং কারও চোখে হঠাৎ করে অস্বস্তি পানি পড়া, রোদে বা আলোতে তাকাতে অসুবিধা হওয়া, চোখে কম দেখা ইত্যাদি উপসর্গ হলে জরুরীভাবে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

জটিল কর্ণিয়ার আলসার রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়ে জীবাণু পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে।

**প্রশ্ন : চোখের কসমেটিক্স ব্যবহারে কি কি সতর্কতা প্রয়োজন ?**

উত্তর : সাধারণ সাজসজ্জার অংশ হিসেবে মহিলাদের অনেকেই চোখে নানা ধরনের কসমেটিক্স ব্যবহার করে থাকেন।

কসমেটিক্স ব্যবহারের ফলে অনেকের চোখের পাতা ফুলে যায়, চুলকায়, চোখ

লাল হয় এবং পানি পড়ে। এগুলো ব্যবহার না করলে বা বন্ধ করলে সকল উপসর্গ কমে যায়। বেশিরভাগ কসমেটিক্সই এক জাতীয় কেমিক্যাল। সুতরাং অনেকের বেলায় এ থেকে চক্ষু এলার্জি বা চর্মের এলার্জি হতে পারে।

এসকল সমস্যা হলে প্রাথমিকভাবে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। তাতেও কাজ না হলে কসমেটিক্স এর ব্রান্ড পরিবর্তন করা কিংবা ঐ কসমেটিক্স ব্যবহার বন্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে।

**প্রশ্ন : একজন গ্লকোমা রোগীর কি কি করণীয় ?**

উত্তর : গ্লকোমা যেহেতু চোখের একটি মারাত্মক রোগ এবং নিরব অন্ধত্বের প্রধান কারণ সেজন্যে একজন আদর্শ গ্লকোমা রোগী

১। সঠিকভাবে নিজের চিকিৎসা করাবেন। চিকিৎসক প্রদত্ত চোখের ওষুধ নিয়মিত ও সময়মত ব্যবহার করবেন।

২। নিয়মিত চোখের প্রেসার মাপার জন্য এবং ভিসুয়াল ফিল্ড এনালাইসিস বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য চক্ষু ও গ্লকোমা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক চলবেন।

৩। গ্লকোমা সম্পর্কিত পুস্তক পাঠ করবেন এবং ইন্টারনেটে এ সম্পর্কে আধুনিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও অবহিত হবেন।

৪। নিজে জ্ঞানার্জন করে- একজন গ্লকোমা রোগী শুধু নিজেরই পরিচর্যা করবেন না- তিনি অন্যদেরকেও গ্লকোমা রোগ এবং এর জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করবেন।

বিশেষ করে গ্লকোমা যেহেতু বংশগত রোগ- কারও এই রোগ হলে তার ছেলেমেয়ে, বাবা মা এবং রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দেরও গ্লকোমা আছে কিনা তা পরীক্ষা করাতে হবে।

**প্রশ্ন : 'ভিসুয়াল ফিল্ড এনালাইসিস' পরীক্ষাটি কি এবং কেন করা হয় ?**

উত্তর : আমরা সামনের দিকে তাকালে শুধু সোজাসুজিই দেখি না- দুই পাশও দেখতে পাই। এই পার্শ্ব দেখাটার নাম দৃষ্টির পরিসীমা। দৃষ্টির পরিসীমা বা ভিসুয়াল ফিল্ড মাপার পদ্ধতির নাম ভিসুয়াল ফিল্ড এনালাইসিস এবং যন্ত্রের নাম ভিসুয়াল ফিল্ড এনালাইজার।

চোখের উচ্চ চাপ গ্লকোমা রোগে- এই দৃষ্টির পরিসীমায় নানা প্রকার পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া চোখের নানা প্রকার রোগে ও সমস্যায় দৃষ্টির পরিসীমায় ত্রুটি ধরা পড়ে।

ব্রেনের অপটিক স্নায়ুতে বা এর গতিপথে কোন চাপ পড়লে বা রোগ হলে রোগীর দৃষ্টির পরিসীমায় ত্রুটি হতে পারে।

এই পরীক্ষাটি পূর্বে ম্যানুয়াল বা হাতে করা হত বর্তমানে আরও গ্রহণযোগ্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে করা হয়। এ ধরনের যন্ত্রের নাম কম্পিউটারাইজড পেরিমিটার।

**প্রশ্ন : চক্ষু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বর্তমানে কি কি আধুনিক পরীক্ষা করা হয় ?**

উত্তর : সঠিক চক্ষু রোগ নির্ণয়ের জন্য এবং সুচিকিৎসার জন্য বর্তমানে অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

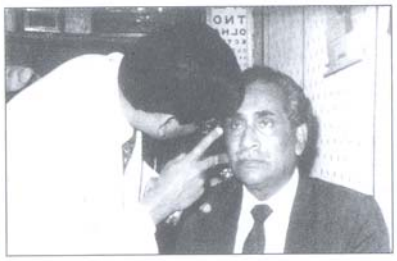

চোখের পাওয়ার নির্ণয়ের জন্য কম্পিউটার বা অটোরিফ্রাকটোমিটার, অনেক গুণ বড় করে চোখের খুব সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষার জন্য ব্যবহার হয় স্লিটল্যাম্প বায়োমাইক্রোসকোপ। এই যন্ত্রের সংগে কয়েকটি লেন্স ব্যবহার করে চোখের ভেতরের রেটিনার বিস্তারিত দেখা সম্ভব হয়। চোখের প্রেসার মাপার জন্য স্লিট

ল্যাম্পের সাহায্যে প্রেসার মাপার যন্ত্র যুক্ত করে- তা মাপা যায় যার নাম অ্যাপলানেশন টনোমেট্রি (Applanation Tonometry) যদিও চোখের প্রেসার মাপার জন্য আলাদা যন্ত্রপাতিও রয়েছে। চোখ স্পর্শ না করেও চোখের প্রেসার মাপার যন্ত্রও রয়েছে যার নাম নন কন্টাক্ট টনোমিটার।

চোখের রেটিনা পরীক্ষার জন্য ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট অফথ্যালমোস্কোপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য কম্পিউটারাইজড দৃষ্টি পরিসীমা মাপার যন্ত্র বা ভিসুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইজার(Visual Field Analyser, Computerised Perimetry)

হাইডেলবার্গ রেটিনা টমোগ্রাফি (HRT) নার্ভ ফাইবার লেয়ার এনালাইজার,

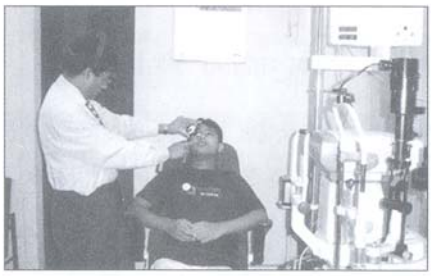

আলট্রাসাউন্ড বায়োমাইক্রোস্কোপ (UBM), অপটিক্যাল কোহোরেন্স টমোগ্রাফি (OCT) প্যাকিমিটার (Pachymeter) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চক্ষু রোগ নির্ণয়ে 'কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি' এবং 'ফান্ডাস ফ্লুরেসিন এঞ্জিওগ্রাফী' এখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

চক্ষু রোগ চিকিৎসার জন্য আরগন লেজার, ডায়ড লেজার, ইয়াগ লেজার, এক্সসাইমার লেজার, সিলেকটিভ লেজার সহ নানা ধরনের লেজারের ব্যবহার করা হচ্ছে।

**প্রশ্ন : গ্লকোমা রোগ কি লেজার চিকিৎসায় ভালো হয় ?**

উত্তর : হ্যাঁ- লেজার রশ্মি ব্যবহার করে কয়েক ধরনের গ্লকোমার চিকিৎসা করা হয়। এঙ্গেল খোলা গ্লকোমার জন্য আর্গন লেজার ট্রাবিকুলোপ্লস্টি (ALT), সিলেকটিভ লেজার ট্রাবিকুলোপ্লাস্টি (SLT) করা হলে অনেকের চোখের প্রেসার কমে যায়। এঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার জন্য ইয়াগ লেজার পেরিফেরাল আইরোডোটমি (YAG Laser P.I.) আরগন লেজার পেরিফেরাল আইরোডোপ্লাস্টি (ALPI) করা হয়ে থাকে।

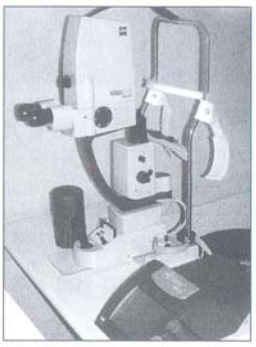

ডায়াবেটিসে রেটিনার রক্তক্ষরণ হলে বা রেটিনার রক্তনালী বন্ধ হয়ে অনেক সময় চোখের চাপ বাড়তে পারে- যার নাম নিওভাসকুলার গ্লকোমা। এই ধরনের গ্লকোমার চিকিৎসা হিসেবে- রেটিনার লেজার- আরগন লেজার ফটোকোগুলেশন (ALP) করা হয়।

**প্রশ্ন : চোখের ছানির আধুনিক চিকিৎসা 'ফ্যাকো সার্জারী' কি নিরাপদ ?**

উত্তর : হ্যাঁ- একজন অভিজ্ঞ ফ্যাকো সার্জন এর হাতে ফ্যাকো সার্জারী একটি নিরাপদ সার্জারী। তবে যেহেতু এটি শল্য চিকিৎসা- তাই যেকোন শল্য চিকিৎসার মত এই সার্জারীতে কিছু জটিলতা হতে পারে।

ছানি বেশি পেকে গেলে বা চোখের লেন্স যদি বেশি শক্ত হয়ে যায়, চোখের মণি বা পিউপিল যদি প্রয়োজনের তুলনায় বড় না হয়, বিশেষ ধরনের ছানি যেমন- পিপিসি, লেন্সের জনিউল বা আটকে থাকা সুতার দুর্বলতা থাকে তাহলে ফ্যাকো সার্জারীতে জটিলতা হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অন্য যে কোন অপারেশন এর মতো ফ্যাকো সার্জারীতেও ইনফেকশন বা প্রদাহ হতে পারে। সাধারণত: সার্জনগণ এসকল বিষয়ে অপারেশন এর পূর্বেই মূল্যায়ন করে জটিলতা এড়ানোর ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

**প্রশ্ন : চোখের সমস্যার জন্য কি মাথা ব্যথা হয় ?**

উত্তর : চোখের সমস্যার জন্য মাথা ব্যথা হতে পারে তবে অনেকে ধারনা করেন মাথা ব্যথার মূল কারণ চোখের সমস্যা- সেটা ঠিক নয়।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মাথা ব্যথার ৪টি প্রধান কারণ- ১. টেনশন থেকে মাথা ব্যথা ২. মাইগ্রেন থেকে মাথা ব্যথা ৩. চোখ, কান ও দাঁতের সমস্যায় মাথা ব্যথা ৪. উচ্চ রক্তচাপ, ব্রেন টিউমার বা শারীরিক অন্যান্য কারণে মাথা ব্যথা। দৈনন্দিন বিভিন্ন কারণে টেনশন থেকে মাথা ব্যথা হলেও চোখে এবং চোখের পাশে, ঘাড়ে, মাথার পেছনে ব্যথা হতে পারে। টেনশন কমে গেলে এবং সাধারণ ব্যথার ওষুধ খেলে এ ধরনের মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

মাইগ্রেন থেকে মাথা ব্যথা : সাধারণত উত্তেজক কোন কারণ যেমন- হৈ চৈ, সোরগোল, হাটবাজারে গেলে, উজ্জ্বল কোন আলোতে গেলে, মহিলাদের মাসিকের সময়, কোন কোন খাবার খেলে ইত্যাদি নানা কারণে মাইগ্রেনের উপসর্গ বেড়ে মাথা ব্যথা হতে পারে। সাধারণত মাথার একদিকে ব্যথা করে এবং বমি হয় কিংবা বমি বমি লাগে। নীরব স্থানে এবং অন্ধকারে রোগী আরাম বোধ করেন।

চোখের কারণে মাথা ব্যথার প্রধান কারণ-

- দীর্ঘক্ষণ যাবৎ চোখের কাজ যেমন পড়াশুনা করা, টিভি দেখা বা কম্পিউটারে কাজ করা। যাদের চোখের পাওয়ার আছে অথচ চশমা পরছেন না তাদের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার হার অনেক বেশি। এসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখের বিশ্রাম দেয়া গেলে এবং প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেলে এ ধরনের মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যায়। অনেক সময় শিশুদের চোখে সামান্য পাওয়ার বিশেষ করে সিলিন্ডার পাওয়ার থাকলে চোখ ছোট করে তাকিয়ে ভালো দেখতে পায়। এতে চোখের অ্যাকোমোডেশন বা সামঞ্জস্যকরণ বেশি করতে হয়, চোখের মাংশপেশি ও স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে তাতে মাথা ব্যথা হতে পারে। এ সকল শিশুকে প্রয়োজনীয় চশমা দেয়া হলে মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

**প্রশ্ন : চল্লিশ বছর বয়সে চশমা লাগে কেন ?**

উত্তর : অনেকের ছোটবেলা থেকে কোনদিন চশমা না লাগলেও চল্লিশ বছর বয়সের সময় পড়াশুনা করার জন্য চশমার প্রয়োজন হয়। এই অবস্থার নাম- চালশে বা ডাক্তারী ভাষায় প্রেসবায়োপিয়া।

ছোটবেলায় আমাদের চোখের লেন্স অনেক নমনীয় এবং নরম থাকে। চোখের সামঞ্জস্যকরণ বা অ্যাকোমোডেশন পদ্ধতির মাধ্যমে লেন্সের পাওয়ার বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয়। দূরে দেখার জন্য চোখের যতোটা পাওয়ার (ডায়াপ্টার) দরকার নিকটে পড়ার জন্য তার থেকে কয়েক ডায়াপ্টার বেশি দরকার।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলে লেন্স শক্ত হতে থাকে, নমনীয়তা কমে যায়, অ্যাকোমোডেশন ক্ষমতাও কমে যায়। এজন্যে প্লাস পাওয়ার চশমা ব্যবহার করে চোখের পাওয়ার বাড়ানো হয় এবং পড়াশুনা করা ও নিকটের সকল কাজ করা যায়। এভাবেই যত বয়স বাড়বে ততই লেন্সের নমনীয়তা কমে। শক্ত হতে থাকে এবং তত বেশি প্লাস পাওয়ার এর চশমা পরার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন : মদ্যপানে কি চোখ অন্ধ হয় ?**

উত্তর : যারা মদ্যপান করেন, ধুমপান করেন বিশেষ করে যারা সিগার ও পাইপ টানেন- তাদের অনেকের চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়- এমনকি অন্ধও হয়ে যেতে পারেন।

আমাদের দেশে 'রেকটিফাইড স্পিরিট' খেয়ে অনেকেই চোখের দৃষ্টি চিরতরে হারিয়েছেন। যারা খাবার প্রতি উদাসীন, শরীরে প্রয়োজনীয় আমিষ ও পুষ্টির অভাব, তারা যখন অনেক মদ্যপান করেন তখন তাদের ক্ষেত্রে চোখে না দেখার উপসর্গ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর বমি ভাব হয়, মাথা ব্যথা হতে পারে, চোখে ঝাপসা দেখেন, রং বুঝতে অসুবিধা হয়, ভিস্যুয়াল ফিল্ড পরীক্ষা করলে 'সেন্ট্রোসিকাল স্কোটমা' নামক ত্রুটি ধরা পড়ে। এ সময় মদ, সিগারেট ইত্যাদি খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে 'হাইড্রোক্সিকোবালামিন' নামক ভিটামিন ইনজেকশন প্রদান করা হলে অনেক রোগীর দৃষ্টিশক্তি অবনতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত চোখের অপটিক নার্ভ একবার শুকিয়ে গেলে- আর কোন চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না এবং রোগী অন্ধ হয়ে যান।

**প্রশ্ন : কি কি ওষুধ চোখের জন্য ক্ষতিকর ?**

উত্তর : অনেক ওষুধেই চোখের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি ওষুধে দৃষ্টিশক্তির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ : ফোঁটা হিসেবে চোখে প্রচুর ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। চোখের এলার্জি, চোখের প্রদাহ এসব ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ফোঁটা ওষুধ অনেকদিন

ধরে ব্যবহার করলে চোখের ইনফেকশন বাড়তে পারে, চোখের চাপ বেড়ে গ্লকোমা হতে পারে। এ জাতীয় ওষুধ খাবার বড়ি বা ইনজেকশন আকারে ব্যবহার করলে রোগীর ডায়াবেটিস বেড়ে যেতে পারে। রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে এবং চোখে ছানি ও গ্লকোমা হতে পারে।

যক্ষ্মা রোগে ব্যবহৃত ওষুধ- ইথামবুটাল ব্যবহার করলে অনেকের চোখের অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যেতে পারে। হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যামিডারোন ব্যবহার করলে কর্ণিয়ার উপর দাগ পড়ে যায় এবং অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যায়।

খিচুনি রোগের ওষুধ ভিগাবাট্রিন খেলে চোখের রং দেখার পরিবর্তন হয় এবং দৃষ্টির পরিসীমায় ত্রুটি হয়।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনিন অনেকের চোখে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া করতে পারে ও অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যেতে পারে।

মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য এসব ওষুধ লেখার পর চিকিৎসকগণ মাঝে মাঝেই রোগীর ফলোআপ করে থাকেন, দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা, ভিসুয়াল ফিল্ড এনালাইসিস ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। চোখের কোন সমস্যা ধরা পড়লে ঐ ওষুধ বন্ধ করে অন্য কোন ওষুধ দিতে হবে।